সভ্যতা বিনির্মাণে

আকিদাহ

সভ্যতা বিনির্মাণে আকিদাহ

العقيدة وأثرها في بناء الجيل

শাইখ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ

তরজমা

আবু তালহা

মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

পরিবেশনায়

AS SAIF MEDIA

তাওহিদ ও আকিদাহর

বাস্তবচিত্রের সেই লোকগুলো।

নিজ নিজ যুগের প্রবাদপুরুষ,

একাই উম্মাহ।

কথামুখ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আকিদাহ শব্দটি উচ্চারণ করলেই চোখে ভেসে ওঠে আল্লাহর সিফাত-কেন্দ্রিক তর্ক ও জটিল জটিল তত্ত্বীয় আলোচনা। মনে হয় আকিদাহ শব্দটি এই অধ্যায়ের জন্যই নির্দিষ্ট। মূলত আকিদাহ দ্বীনের এক মৌলিক ও বিস্তৃত বিষয়। আকিদাহ একজন ব্যক্তির আমলি জীবনে, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কী গভীর প্রভাব ফেলে তা আজকের বিশ্বসভ্যতা ও মুসলিম উম্মাহর দিকে নজর দিলেই বোঝা যায়। চামড়া আমাদের মতো অথচ কথা বলছে পাশ্চাত্যের মুখে মুখ রেখে, অবিকল তাদের মতো। তাদের মতাদর্শ ও রীতিনীতির ধারক-বাহক এবং দায়ি সেজে এর প্রচার করে চলেছে, আর একশ্রেণি তো নীতিনির্ধারক হিসেবে পুরো জাতির ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। এ সবকিছু হয়েছে এক বিশেষ আকিদাহ-বিশ্বাসের ওপর দীর্ঘমেয়াদি তরবিয়াতের কারণে।

ইংরেজরা চলে গেলেও ওদের গোলামি করার যাবতীয় উপকরণ ঠিকই রেখে যায়। এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা রেখে যায়, যা ওদের ভ্রষ্ট রীতিনীতি ও আদর্শের আকিদাহ- বিশ্বাসকেই শক্তিশালী করে। এই যুগে ভালো ইংরেজি বলতে পারলে, একটু ওদের মতো হতে পারলে মনে হয়, এই বুঝি জাতে ওঠা গেল। এই সমাজে সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্তদেরই শিক্ষিত এবং সমাজের মূলধারা ভাবা হয়। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরাই যেন মানবতার মুক্তিদূত। বিজ্ঞান যেন মানবতার মুক্তির সনদ, দর্শনশাস্ত্র যেন উচ্চমার্গীয় জ্ঞানতত্ত্ব। এমন সব বিশ্বাস ও ধারণা লালনকারীদের দেখবেন, তারা কুরআন তিলাওয়াতও করে আবার বুঝে-না-বুঝে কুরআনকে দুনিয়াবি সকল জ্ঞানের উৎস বলেও প্রচার করে। কুরআনকে আধুনিক বিজ্ঞানের উৎস বলে আত্মপ্রসাদে ভোগে; ধর্মের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য যেন সব আদায় হয়ে গেছে! অদ্ভুত, তারাই আবার এই নবুওয়াতি শিক্ষাকে মনে করে পশ্চাৎপদ। কুরআনি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মূর্খ জ্ঞান করে! ভাবেই না বিজ্ঞানের মূল্য দিতে গিয়ে ওয়াহির মর্যাদাকে কোন পর্যায়ে সে নামিয়েছে, 'বিজ্ঞানীরা কুরআন থেকেই সব নিয়েছে, ভাবখানা এমন, বিজ্ঞানই জ্ঞানের মূল উৎস এবং যেকোনো মূল্যে এর সত্যতা ও সততা বজায় রাখা জরুরি। অথচ সে জানেই না কুরআন

এ থেকে কত ঊর্ধ্বে, এসব বস্তুতান্ত্রিক উৎকর্ষতা ওয়াহির মূল মাকসাদ নয়। মূলত ওয়াহির মর্যাদা সম্পর্কে তার মন-মগজ বেখবর। যাদের ওপর এই ওয়াহির জ্ঞান নাযিল হয়েছিল—আম্বিয়া আলাইহিস সালাম—তাঁরা ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ; তাঁদের দায়িত্বই ছিলো পথহারা, আত্মভোলা ও বিভ্রান্তদের হিদায়াতের পথে ডাকা, তাওহিদের প্রতি আহ্বান করা এবং বান্দা ও মালিকের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব আন্জাম দেয়া। এ তাওহিদের জন্যে কখনো তাঁদের নিজ কওমের বিরাগভাজন হতে হয়েছে, কওম থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে, এমনকি লড়াইয়েও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। কোনো বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সাথে তাঁদের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। মূলত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বীকৃত বিষয় ও আবিষ্কার এবং আধুনিক প্রযুক্তির স্বাভাবিক উৎকর্ষকতাকে ইসলাম অস্বীকার করে না বরং এগুলোর প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে এই নানামাত্রিক দূষিত মতবাদ-দর্শনের মূল কারণ হলো নোংরা আকিদাহ-বিশ্বাস, ইংরেজদের রেখে যাওয়া সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা ও আইনব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি কুপ্রভাব এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্য শক্তি ও ক্ষমতার যে দাপট, মনোজগতে এর প্রভাববিস্তার। যার বড়ত্ব ও প্রভাব মানুষ নিজ মগজ ও অন্তরে ধারণ করে, তার মতবাদ ও আদর্শকেই সে লালন ও পালন করবে; এটিই তিক্ত বাস্তবতা।

একটি চিত্র লক্ষ করুন, এক ব্যক্তি খুব সালাত আদায় করছে, তাসবিহ-তাহলিল করছে, নফল সাওমও বাদ যায় না, এ ব্যক্তিটিই সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে ভিন্ন চিন্তাধারা বহন করে চলেছে। দ্বীনকে ব্যক্তি জীবনে অনুপ্রবেশের কোনো অধিকার সে দেয়নি। তার মসজিদ একরকম, পরিবার অন্যরকম, তার সামাজিক রীতিনীতি ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা। বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যক্তিজীবনে দ্বীনের কোনো চিহ্ন নেই। তার মতে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে দ্বীনের হস্তক্ষেপ চলবে না। আল্লাহ হিফাজত করুন। এ ছাড়াও আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা, আল্লাহ ও নবির শত্রুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রেরণা তো নেই-ই বরং এই সম্পর্ক স্থাপনকে ইমান-বিরোধী বা কিছুই মনে করা হয় না। তাই তো দেখবেন, স্বঘোষিত নাস্তিকদের সাথেও অটুট সম্পর্ক থাকে, চলাফেরাসহ সব সামাজিকতাই বহাল তবিয়তে চলে। ঘরের নিজ ছেলেটি বা মেয়েটি নাস্তিকতা ও সমকামিতা প্রচার করে বেড়ালে কিংবা প্রিয়তম নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিলে রক্তের সম্পর্কই প্রাধান্য পায়। তারা যেন আল্লাহর এই আয়াতকে নিষ্ক্রিয় করার হাজারো বাহানা খোঁজে,

'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। আল্লাহ তাদের অন্তরে ইমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দিয়ে। তিনি তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।' (সুরা মুজাদালাহ, ৫৮:২২)

এই যে চিত্রগুলো আমরা দেখছি, এর মূল সমস্যা কী, কেন এমন হচ্ছে? আসলে এই মানুষগুলো সার্বিক জীবনে দ্বীনকে সমাধান হিসেবে নেয়নি, একে জীবনবিধান বলে ভাবেনি, একে বিশ্বাস ও জীবনধারণের উৎস বলে গ্রহণ করেনি। এই দ্বীনকে মানবজীবনের প্রতিটি সমস্যা-সমাধানের অবশ্যপালনীয় মাধ্যম করেনি। তাদের আকিদাহ-বিশ্বাসে বিস্তৃত শরিয়াহর অনুপ্রবেশ নেই। ফলে, আজ আকিদাহর এই বিপর্যয়ে এমন হাজারো চিত্র দেখা যাচ্ছে।

প্রতিটি সভ্যতা বিনির্মাণে, সমাজ গঠনে আকিদাহ-বিশ্বাসই কাজ করেছে। মানুষ তার বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে চায়, একে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায়, একে বিজয়ী করতে চায়, এই-ই মানুষের স্বভাবধর্ম। আপনি ইউরোপ রেনেসাঁর দিকে তাকান, ওখানেও এক নির্দিষ্ট বিশ্বাসই কাজ করেছে। রুশ বিপ্লব দেখুন, ওখানেও তাই। মানবসভ্যতাকে তার আকিদাহ-বিশ্বাস থেকে ভিন্ন করা মানে স্বাভাবিক সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া; আর একে গুরুত্বহীন মনে করা মানে পুরো বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। বদরের দিকে তাকান, এক নির্দিষ্ট বিশ্বাসই আগামী পৃথিবীর মানচিত্র এঁকে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই আকিদাহর কারণেই আমরা দেখেছি ইয়ারমুকের প্রান্তর, চিত্র দেখেছি কাদেসিয়ার। ফলে ইসলাম তৎকালীন দুটো বিরাট সভ্যতাধারীদের ওপর বিজয় লাভ করে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের মতো দাপুটে সভ্যতার অধিকারী এই আকিদাহর কাছেই পরাজিত হয়েছিল, শক্তির কাছে মাথানত করেছিল এবং ইসলামের স্বয়ং বিপুলতা ও সমৃদ্ধি দেখে মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আত্মসমর্পণ করে। ইতিহাস এরই সাক্ষ্য দেয়। ইসলামি ইতিহাসের ঘটনা পরিক্রমা আমাদের বুঝতে শেখায়, কোনো সভ্যতা বা মতাদর্শকে পরাজিত করতে হলে এরচেয়েও সমৃদ্ধ ও রুহানি আকিদাহ হাজির করা জরুরি। আর এও বাস্তব যে, নিছক তত্ত্বগত আলোচনা ও চিন্তাজগতে দাপিয়ে বেড়িয়ে কোনো মতাদর্শ ও আকিদাহকে পরাজিত করা যায় না; বরং সভ্যতা কিংবা মতাদর্শ যেমন শক্তির বলয়ে পুষ্ট

হয়, বেড়ে ওঠে, ঠিক তেমনি একে শক্তি দিয়েই প্রতিহত করতে হয়, চূর্ণ করে দিতে হয়। গোটা ইসলামি ইতিহাস তাই-ই বলে।

বর্তমান যামানায় মুসলিম উম্মাহ যে চিন্তাদর্শ ও মনস্তাত্ত্বিক বৈকল্যের শিকার, ভ্রষ্ট মতাদর্শ এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও তাদের আইনব্যবস্থার গোলাম, এ সবকিছুর কারণ চিহ্নিত করার সাথে সাথে এর গোড়ায় আঘাত করেছেন আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ। গাছের মূলে আঘাত করলে এর শাখা-প্রশাখাগুলো এমনিই নিস্তেজ হয়ে পড়বে। এ জন্যে একটি একটি করে শাখা-প্রশাখার দিকে নজর দিতে হয় না। বইয়ের লেখক নিজেই বইটির মুকাদ্দিমাহ লিখেছেন। ওই অংশে এই বইয়ের হাকিকত এসে গেছে। আগ্রহী পাঠকের উচিত হবে ওই অংশটি মনোযোগের সাথে আত্মস্থ করা।

অবশেষে পাঠকদের হাতে শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর আকিদাহর বইটি তুলে দিতে যাচ্ছি; এ জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করি। তাঁর একান্ত করুণায়ই এটি সম্ভব হয়েছে। এটি মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না যে, আমাদের ভূমিতে সঠিক আকিদাহ-চর্চার পরিসর খুব সীমিত। মৌলিক আকিদাহ নিয়ে খুব একটা কাজ এখানে হয়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শাইখ আযযামের বইটিকে চূড়ান্ত ইলমি বই না বলা গেলেও সাধারণের জন্যে উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। মূল আরবি কিতাব 'আলআকিদাতু ওয়া আসারুহা ফি বিনায়িল জিল', অনুবাদটির নাম রাখা হয়েছে 'সভ্যতা বিনির্মাণে আকিদাহ'। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অনুবাদকদ্বয়কে উত্তম বিনিময় দান করুন। এ কাজের সাথে যারা কোনো-না-কোনোভাবে জড়িত, তাদের উত্তম বিনিময় দিন। আমরা মানুষ, ভুল-ত্রুটি হবেই। বইয়ে কোনো ভুল-ত্রুটি পেলে আমাদের জানাবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে আমরা শুধরে নেবো।

তাইব হাসান
২৭.১১.২০১৮

লেখক পরিচিতি

জন্ম : শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশের একটি গ্রামে ১৯৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

পড়াশোনা : প্রাথমিক শিক্ষা তিনি নিজ গ্রামেই অর্জন করেন। তুলকারমের খাদুরি এগ্রিকালচারাল কলেজ থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রি এবং ১৯৬৬ সালে সিরিয়ার দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ অনুষদ থেকে শরিয়াহর ওপর গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহর ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ১৯৭৩ সালে 'উসূলুল ফিকহ'-এর ওপর আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রিও লাভ করেন তিনি।

শিক্ষকতা : ১৯৭০ সালে আম্মানের জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়াহ অনুষদে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সালে জর্দান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন সৌদি আরবের কিং আবদুল আযিয বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

রচনাবলি : কর্মমুখর এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও শাইখের কলম থেমে থাকেনি। ইলমের খিদতমাত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। উম্মাহর বিশাল দায়িত্বের পাশাপাশি ইলমি কাজের আন্জামও তিনি দিয়েছেন। শাইখের লিখিত কিছু বই :

১. আলআকিদাতু ওয়া আসারুহা ফি বিনায়িল জিল

২. আলইসলাম ওয়া মুসতাকবিলুল বাশারিয়াহ

৩. আলহাক্কু বিল কাফিলাহ

৪. আদদিফা আন আরাদিল মুসলিমিন

৫. আসসারাতানুল আহমার

৬. আলকাওয়ায়িদুল ফিকহিয়াহ

৭. আলকাওমিয়াহ

৮. আলমানারাতুল মাফকুদাহ

৯. আলহিজরাতু ওয়াল ইদাদ

১০. আলওয়াসিয়াহ

১১. বাইনাল মিলাদি ওয়াল ইসতিশহাদ

১২. তিজারুল হুরুব

১৩. যিকরিয়াতু ফালাস্তিন

১৪. সাআদাতুল বাশারিয়াহ

১৫. ইবরুম মিনাস সিরাহ

১৬. উশশাকুল হুর

১৭. ফি যিলালি সুরাতিত তাওবাহ

১৮. মাবাহিসুন ফিস সালাহ

এ ছাড়াও তাঁর আরও বই, রিসালাহ্, অডিও-ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রমণ শাইখকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি রুশবিরোধী এই যুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে লাগলেন। ফাতওয়া, সেমিনার, দাওয়াতে আলিম-উলামা ও দায়িদের দৃষ্টি আকর্ষণে খুব পরিশ্রম করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় আফগান যুদ্ধ আরবদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আফগান সমস্যা যে উম্মাহর সমস্যা, তা সবার সামনে ফুটে ওঠে বলা যায় তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই। সকল ফিকহি ইখতিলাফের ঊর্ধ্বে উঠে উম্মাহর ঐক্যের জন্য তিনি আফগান ভূমিকেই বেছে নিয়েছিলেন। শাইখ নিজেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

শাহাদাত : ২৪ নভেম্বর, ১৯৮৯, শুক্রবার। পাকিস্তানের পেশোয়ারের এক মসজিদে জুমুয়াহর খুতবাহ দেবার যাবার পথে পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে শাইখ তাঁর দু'সন্তানসহ শহিদ হন। আল্লাহ তাঁর জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন।

সূচি

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

শুরুর কথা

قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ٢٥ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى

‘হে আমার রব, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন।’১

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

‘হে আমাদের রব, হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরগুলো বক্র করে দেবেন না। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই বড় দাতা।’২

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

‘হে আমাদের রব, আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের মার্জনা করুন, আমাদের ক্ষমা করুন, আর আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব, আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।’৩

---

১. সুরা তোয়াহা, ২০ : ২৫-২৬

২. সুরা আলি ইমরান ৩:৮

৩. সুরা বাকারাহ, ২ : ২৮৬

رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

'হে আমাদের রব, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন।'৪

رَبَّنَا وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْوَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন।'৫

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের রব, আপনি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চোখ শীতল করবে। আর আপনি আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।'৬

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

'হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার বাবা-মা ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।'৭

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ইমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের ক্ষমা করুন। আর যারা ইমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।'৮

---

৪. সুরা কাহফ, ১৮ : ১০

৫. সুরা বাকারাহ্, ২ : ২০১

৬. সুরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪

৭. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ৪১

৮. সুরা হাশর, ৫৯ : ১০

এই ভেবে আমার ভালো লাগছে যে, ছোটো একটি বইয়ে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বেশকিছু বাস্তবতা এবং বিস্মৃতপ্রায় কিছু মৌলিক বিষয় প্রিয় পাঠকদের সামনে পেশ করতে পেরেছি। আসলে মানুষের পুরো জীবনটাই এসবের আবর্তে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হতে থাকে, বরং গোটা জগৎই এসব প্রাথমিক বিষয় ধারণ ও লালন করে দাঁড়িয়ে আছে। মানবজীবনে ইমান ও আকিদাহ কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আকিদাহর বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়াই যে আজকের মানবসভ্যতার বিপর্যয়ের কারণ, তা আমি বইটির ভূমিকায় বেশ গুরুত্বের সাথেই আলোচনা করেছি।

পুরো বইটি আমি নয়টি অধ্যায়ে সাজিয়েছি। প্রথম অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি আকিদাহ ও তাওহিদের অর্থ নিয়ে। সেখানে আমি এ কথাও প্রমাণ করেছি যে, গোটা বিশ্বের প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক সব আইন-কানুনই আল্লাহর তাওহিদের সাক্ষ্য বহন করছে এবং তাঁরই ইবাদত করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি যে, আজকের মানবসভ্যতার দীনতার কারণ হলো বিশুদ্ধ আকিদাহ রেখে বক্র ও বিকৃত বিশ্বাসে আক্রান্ত হওয়া। তা ছাড়া বিজ্ঞান আর দ্বীন-ধর্মের মাঝে যে বৈরিতা তৈরি হয়েছে সেটিও মূলত বিশুদ্ধ আকিদাহর অনুপস্থিতির কারণেই হয়েছে।

এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে আকিদাহর কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব উল্লেখ করা হয়েছে, যা গোটা মানবসভ্যতাকে একটি মৌলিক ভিত্তি ও অবস্থানের ওপর স্থির করবে।

তারপর চতুর্থ অধ্যায়ে আল্লাহ ওয়া সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সিফাত বা গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আমি এ ব্যাপারে সালাফ ও খালাফের'[৯] মতামত ও সিদ্ধান্তের পার্থক্য উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে সেই মহাসিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থার কথা যাকে সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই দ্বীনের আবির্ভাব হয়েছে। আর তা হলো আল্লাহর বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

---

৯. সালাফ—শাব্দিক অর্থে পূর্ববর্তী। পরিভাষায়, উম্মাহর প্রথম দিককার আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহর আলিমগণ। খালাফ—শাব্দিক অর্থে পরবর্তী। পরিভাষায়, সালাফের মানহাজের সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণকারী পরবর্তীকালের আলিমগণ। (অনুবাদক)

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহর শরিয়াহ পরিত্যাগ করাই হলো এই পবিত্র জীবনব্যবস্থার গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবার মূল কারণ। সপ্তম অধ্যায়ে ওইসব অপব্যাখ্যার আলোচনা করা হয়েছে, যা তাশরি-সংক্রান্ত'১০ আয়াতের ক্ষেত্রে সচরাচর মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

এরপর আসবে অষ্টম অধ্যায়। যেখানে এমনকিছু অকাট্য ও শক্তিশালী দলিল- প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হবে, যা বহু অনুসন্ধান ও ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহর দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যের কারণ হলো ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদাহ থেকে সরে যাওয়া।

আর নবম অধ্যায়ের মাধ্যমে আমি সমাপ্তি টেনেছি। সেখানে আমি ওই কীর্তিমান আদর্শ-পুরুষদের নিয়ে আলোচনা করেছি, যারা বিশুদ্ধ আকিদাহর ছায়ায় লালিত- পালিত হয়েছিলেন। মজবুত আকিদাহ-বিশ্বাস তাঁদের কীর্তিমান করে তুলেছিল। এই চেতনা সুউচ্চ মিনার হিসেবে গোটা বিশ্বের সামনে তাঁদের দাঁড় করিয়েছিল, যাদের দেখে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া মানুষগুলো পথ খুঁজে পেয়েছে। সৌভাগ্যের পেছনে ছুটে চলা দলগুলো, নাজাতের জন্য ধেয়ে চলা মানুষগুলো তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করেছে।

---

১০. তাশরি (تشريع) — বিধান প্রণয়ন বা আইন প্রণয়ন। বিধান প্রণয়নের অধিকারকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা তাওহিদের অন্যতম অংশ। (অনুবাদক)

মুকাদ্দিমাহ

মানবসভ্যতা বিনির্মাণে আল্লাহর পছন্দনীয় মানহাজ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

‘তবে কি তারা আল্লাহ-প্রদত্ত দ্বীন বাদ দিয়ে (অন্য কিছু) তালাশ করে? অথচ আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে, সবই ইচ্ছায় কিবা অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।’[১১]

আকিদাহ এমন এক নিয়ন্ত্রক যা মানুষের কাজকর্ম, আচার-আচরণ থেকে শুরু করে সার্বিক ব্যবহারবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। তার চালচলনের রীতিনীতিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আকিদাহর মজবুতি ও গভীর দৃঢ়তা থেকেই হৃদয়ের প্রতিটি আকুতি, কথাবার্তা উৎসারিত হয় এবং স্ফুরিত হয় একেকটি পদক্ষেপ, কাজকর্ম ও ক্রিয়াতৎপরতা; বরং আকিদাহ ওইসব আলোড়ন ও উদ্বেলতাও নিয়ন্ত্রণ করে যা অন্তর ভেদ করে হৃদয়ানুভূতিকে মাড়িয়ে আত্মার চারপাশ আন্দোলিত করে এবং ওইসব সন্দেহ-সংশয় আর খুঁতখুঁতে ভাবও নিয়ন্ত্রণ করে যা সবসময় কল্পনাজগতে উড়ে বেড়ায়।

তাই সংক্ষেপে বলা যায়, আকিদাহ সকল আচরণবিধি ও ব্যবহাররীতির নিয়ন্ত্রণকক্ষ। সুতরাং আকিদাহর সামান্যতম অংশেও যদি বিচ্যুতি ঘটে তাহলে তা মানুষের পরিব্যপ্ত জীবনে এক ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে এবং সরল পথের মাঝে অঘোচানো এক দূরত্ব সৃষ্টি করবে। তাই

---

১১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৮৩

তো,কুরআনুল কারিম মানুষের আকিদাহ পরিশুদ্ধ করাকে অনেক অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। পুরোপুরি আল্লাহর দিকে ফেরার সাথে সাথে সব ব্যবহার ও আচরণকে মহান এই আকিদাহর সাথে— যা দ্বীনে হানিফের মৌলিক নীতিমালার প্রতিনিধিত্ব করে, যে মৌলনীতি ছাড়া এই দ্বীন টিকে থাকা সম্ভব নয়—যুক্তকরণের নির্দেশ নেই এমন কোনো সুরা পাওয়া যাবে না, মাক্কি বা মাদানি যে সুরাই হোক না কেন। বিশেষ করে মক্কায় অবতীর্ণ সুরাসমূহ, যেগুলো মূলত আকিদাহ সংশোধন ও বিশুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। আকিদাহই একক ও অনন্য বিষয়বস্তু যার বিশুদ্ধকরণের দায়িত্ব ও অনুশীলনের গুরুভার মক্কায় অবতীর্ণ সুরা সমূহ গ্রহণ করেছে।

তাই তো আমরা নিজেদের চলার পথে—একাকী হোক বা সম্মিলিত— যত বিকৃতি আর বক্রতার শিকার হচ্ছি, সবকিছুর মূল কারণ হলো, আমরা কাল্পনিক চিন্তাবিশ্বাস ও অবাস্তব আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। তাই নতুন করে মানবসভ্যতার আকিদাহ সংশোধন ও চিন্তানৈতিক বিশুদ্ধির প্রতি দায়িত্ববান হওয়া খুবই জরুরি। নবোদ্যমে কাল্পনিক বিশ্বাস, অবাস্তব মতাদর্শের সংস্কার ও পরিমার্জনের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রভুত্বের একত্ব মেনে নেয়া, তাঁর বড়ত্ব গভীর থেকে গভীরে গেঁথে নেয়া এবং তাঁর ভালোবাসায় হৃদয়কে কানায় কানায় পূর্ণ করে তোলা আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। তাঁর দাপট ও পরাক্রমের অনুভূতি ছাড়া অন্তরাত্মায় প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

আল্লাহর উলুহিয়াত ও উবুদিয়াতের হাকিকত এবং আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সেতুবন্ধনের অর্থ জানা, মানা ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই তিনটি বিষয়বস্তু বান্দার মনেপ্রাণে পোক্ত করে গেঁথে নেয়া অপরিহার্য—আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর মর্যাদাগত অবস্থান, বান্দা হিসেবে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে জানা, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যোগসূত্র। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, এমন ব্যক্তি থেকে দ্বীনের শাখাগত বিষয় তালাশ করা অর্থহীন, যার মাঝে এই দ্বীনের হাকিকত মজবুত হয়নি এবং যার দেহাবয়বে আল্লাহর বড়ত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়নি, অথচ এই বড়ত্ব মহাজগতের প্রতিটি নির্জীব, সজীব ও প্রাণবন্ত বস্তুর মাঝে প্রতিমুহূর্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আছে। সত্য কথা হলো সুমহান এই দ্বীনের বুঝ ও হাকিকত বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানাই রয়ে গেছে, তাদের বিরাট অংশই বক্রতার শিকার হয়েছে। তারা প্রথাগত ইবাদতের

কিছু ব্যাপার ওই অন্ধের মতো পালন করে যায়, যে কিনা হাতির কান হাতির আঁকড়ে ধরে মনে করে, সে হাতির দেহ ধরে আছে। যখন তাকে বলা হয়, বিবরণ দাও তো দেখি, সে অমনি বিবরণ দিতে শুরু করে—হাতি হলো কঠিন এক টুকরো মাংশপেশির সাথে জড়ানো কিছু লোমগুচ্ছ। সারা দুনিয়ার মানুষ এসেও যদি তাকে বোঝাতে চায় যে ওটা হাতি নয় অন্য কিছু, তবুও তাকে তার অসাড় ধারণা থেকে ফেরাতে পারবে না ।

বর্তমানে আমাদের কাছে প্রশান্তিকর দৃশ্য হলো কোনো ব্যক্তির বিরামহীন ইবাদত, অথচ এই ব্যক্তিই একই সময়ে এমন অসংখ্য ঘৃণ্য কাজে জড়িয়ে পড়ছে, যেগুলো তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দিচ্ছে। যেমন ধরুন, কেউ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কোনো সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা করল অথবা মহাগ্রন্থ কুরআনে বর্ণিত কোনো ফরয বিধান নিয়ে বিদ্রুপ করল। কিন্তু সে বুঝতেই পারল না এই ঠাট্টার মাঝ দিয়ে মূলত সে আল্লাহর বিধানকেই ঠাট্টা করল, ওগুলোর সাথে তামাশা করল। আর তামাশা ও ঠাট্টাকারীর মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবার ব্যাপারে আহলুল ইলমগণ একমত পোষণ করেছেন। এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত হলো দ্বীন ইসলাম অথবা আল্লাহ ও রাসুলকে গালি দেয়া। যে ব্যক্তিই এমন জঘন্য কাজে জড়াবে তার বিরুদ্ধে ইরতিদাদের হুকুম দেয়া হবে। ইমাম মালিক, শাফিয়ি, আহমাদ, লাইস ও ইসহাক রহিমাহুমুল্লাহ এমনই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।'[১২]

---

১২. এ ব্যাপারে ইমামগণের ইজমা রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিধান নিয়ে কটুক্তি, তাচ্ছিল্য বা বিদ্রুপ করে, সে কাফির হয়ে যায়। ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, استدل بعض العلماء بهذه الاية على وجوب قتل كل من طعن في الدين ، إذ هو كافر — কতক ইমাম এই আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেছেন যে, দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে কটুক্তিকারী ব্যক্তি কাফির এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। ইবনুল মানযুর রহিমাহুল্লাহ বলেন, أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل

তাঁরা এই আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন,

وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمۡ فَقَـٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ ۙ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ

'আর চুক্তির পর তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রুপ করে, তবে কাফিরপ্রধানদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো।'১৩

অথচ তাদের মাথায় ধরেই না যে, এমন ঘৃণ্য ও জঘন্য বাক্য ব্যবহারে তাদের বিরুদ্ধে কত কঠিন হুকুম আসতে পারে। আসলে দ্বীনের ব্যাপারে কটুবাক্য ও অবমাননাকর শব্দ প্রয়োগের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন, তার স্ত্রী একেবারেই তালাক হয়ে যাবে, তৎক্ষণাৎ তার নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং সে ইসলামের গণ্ডি থেকে ছিটকে পড়বে। তার হজ্বের বিধান বাতিল হয়ে যাবে, মুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিষিদ্ধ হবে, তার সন্তানেরাও তার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে...ইত্যাদি ইত্যাদি; অথচ এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই স্বচ্ছ ধারণা রাখে না। কত মানুষ আছে দ্বীন-ধর্মকে গালাগাল করে, আবার স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের মতো মেলামেশা বহাল রাখে। নিঃসন্দেহে এ সবই ব্যভিচার এবং তার সন্তান-সন্ততি সবই অবৈধ সন্তান।

আহলুল ইলমগণ এ ব্যাপারে ইজমা পোষণ করেছেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগালকারীকে হত্যা করা হবে। [আলজামিয় লিআহকামিল কুরআন, ১২/৯৬] প্রসিদ্ধ ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله -মুসলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অথবা তাঁর রাসুলকে গালি দিবে, অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিধানকে বাতিল করবে অথবা কোনো নবিকে হত্যা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে; যদিও সে বাকি পুরো শরিয়াহ স্বীকার করে। ইমাম খাত্তাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله —এ ধরনের ব্যক্তিদের হত্যা করার ব্যাপারে একজন মুসলিমও (আলিম) দ্বিমত করেছেন বলে আমার জানা নেই। [আসসারিমুল মাসলুল আলা শাতিমিররাসুল, পৃষ্ঠা : ৯; শামিলাহ সংস্করণ] (অনুবাদক)

১৩. সুরা তাওবাহ, ৯ : ১২

আমি আবারও পূর্বোক্ত আলোচনায় ফিরছি যে, মানুষ দ্বীনের হাকিকত জানে না, বোঝে না, চেনেও না। তারা নব আবিষ্কৃত বিভিন্ন মত-পথ এবং আল্লাহ-প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার ব্যাপারটা একেবারে গুলিয়ে ফেলে। কেবল তাদের অল্পসংখ্যকের মাঝেই আল্লাহর দ্বীনের সামান্য আভা ও সুবাস পাওয়া যায়। তা ছাড়া তাদের ধর্মাচারপদ্ধতির—যা তাদের জীবনাচারকে পরিচালিত করে—বিরাট অংশ জুড়েই আছে প্রবৃত্তির কারসাজি বা মানবরচিত কিছু রসম-রেওয়াজের অনুসরণ।

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (٤٣)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (٤٤)

'তুমি কি তাকে দেখো না, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে ও বোঝে? না, তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট।'[১৪]

তাই আমার মতামত হলো, মানুষের স্বভাব-চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে শরিয়াতের ফুরুয়ি বা শাখাগত মাসায়িলের ওপর তাদের ঐক্যবদ্ধ করার আলোচনা করা একেবারেই ব্যর্থ চেষ্টা ও উদ্ভট চিন্তা এবং প্রবৃত্তির অনুর্বর মাটিতে বীজ বপন করে ফসল ফলানোর ব্যর্থ চেষ্টামাত্র। প্রবৃত্তির ভেতরে গজিয়ে ওঠা জীর্ণ ও দুর্বল ডাল-পালার সাথে রিষ্টপুষ্ট ও মজবুত ডাল-পালা মিলিয়ে মাটির গভীরে প্রোথিত শেকড় বিস্তারকারী কোনো বৃক্ষ বেড়ে ওঠা সম্ভব নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পছন্দনীয় মানহাজের—যা তিনি মানবজাতির জন্য এঁকেছেন—অনুসরণ করা এবং একে আঁকড়ে থাকা।

তাই আমাদের জন্য জরুরি হলো, উর্বর ভূমিতে বীজ বপন করা, এর যথাযথ যত্ন নেয়া ও পরিচর্যা করা, যেন অঙ্কুরটি সরল-সমান্তরালভাবে শেকড়গুচ্ছে দাঁড়াতে পারে এবং ধীরে ধীরে ডালপালা ছড়িয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হতে পারে।

এমনিভাবে এই মহান দ্বীনের স্বার্থে আমাদের ওই পথ ও মতের অনুসরণ করতে হবে, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই মহাজগতের জন্য এঁকেছেন, যেন মানুষ এর ভার বহনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। আর এর জন্য আমাদের একটি ভিত্তি তৈরি করতে হবে,

---

১৪. সুরা ফুরকান, ২৫ : ৪৩-৪৪

যেন এর বীজগুলো মাটির বোনা যায়; অর্থাৎ যেন দিল থেকে দিলে, মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে আকিদাহর বীজ বুনে দেয়া যায়। আর আকিদাহ এমন মজবুত ও সংহত ভিত, যার ওপর দ্বীনের সব শাখাগত বিষয় কেন্দ্রীভূত হতে পারে। কিন্তু এই ভিতের উপস্থিতি ছাড়া বড় থেকে বড় আবিষ্কার ও বিনির্মাণও ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর তাই বলা যায়, দ্বীনের শাখাগত বিষয়াবলির তথ্যানুসন্ধান ও তার কারণ-উপকারণ খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াটা মূলত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত্ত হবার নামান্তর। আর এসবের পেছনে পড়লে আমরা আমাদের প্রত্যাশিত ফলাফল লাভ করতে পারব না।

সুতরাং মানবসভ্যতার জন্য এই দ্বীনকে উপযোগী ও ভারসাম্য করে তুলতে আল্লাহর পছন্দনীয় মানহাজের অনুগামী হতে হবে। প্রথমত, মানুষের হৃদয় থেকে হৃদয়ে বিশুদ্ধ আকিদাহ গেঁথে দেয়ার মাধ্যমে আর দ্বিতীয়ত, প্রতিটি মানুষকে শরিয়াহর যাবতীয় বিধান ও আদেশ মানার প্রতি তাকাযা দেয়া এবং অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে এটি সম্ভব হবে। কারণ, মানুষদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং গঠন ও প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর মনোনীত মানহাজ অনুসরণ করা সরাসরি আকিদাহরই একটি অংশ। আমাদের এও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর মাঝে 'ইলাহি মানহাজ' পূর্ণরূপে প্রকাশ পাওয়াটা খুবই জরুরি। যেন মনে হয় সে পৃথিবীর বুকে হেঁটে চলা এক জীবন্ত কুরআন। তার চলাফেরা ও বোলচালের মাধ্যমে যেন মনে হয় এটি কুরআনেরই চলাফেরা, কুরআনেরই বোলচাল।

সুতরাং একজন দায়ির দায়িত্ব হলো, সে প্রথমে শরিয়াহর মৌলিক বিষয়ের দিকে দাওয়াহ-প্রদান করবে। সর্বসাধারণকে দ্বীনের মূল বিষয়ে দীক্ষিত না করেই শাখাগত বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করা কখনোই উচিত নয়; বরং তাদের দৃষ্টিকে দ্বীনের মৌলিক অবকাঠামোর দিকে নিবদ্ধ করতে হবে। যখন তারা নিজেদের মস্তিষ্কে দ্বীনের পূর্ণ একটি চিত্র এঁকে নেবে, তখন তাদের নিয়ে দ্বীনের পরিব্যপ্ত অঙ্গনে প্রবেশ করবে, দ্বীনের বিস্তৃত ও শাখাগত মাসয়ালাগুলো শিক্ষা দেবে। সূচনালগ্নে এভাবেই ইসলাম মানুষের হৃদয়কে গঠন করেছে এবং যখনই ইসলাম দিয়ে মানুষকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হবে, তখন এভাবেই করতে হবে।

সুতরাং এসব আদেশ-নিষেধ যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরিহার্য বিধান, তেমনি তার অনুসরণ ও বাস্তবায়নও অলঙ্ঘনীয় বিধান। এভাবে মানুষের আত্মবিনির্মাণেও আল্লাহর পছন্দনীয় মানহাজ মেনে চলা আবশ্যক। আর এই দ্বীনের ভিত্তি নির্মাণে দীর্ঘ মেহনতও ব্যর্থ হয়ে যেতে

পারে, যদি আল্লাহর নির্বাচিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া মেনে না নেয়া হয়। কারণ, আল্লাহর দ্বীন কখনো আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া টেকেনি, আর টিকবেও না। মহান রব যে সংশোধনরীতির চিত্র এঁকেছেন, তার অনুবর্তী হওয়া ছাড়া এর ভিতও কখনো দাঁড়াবে না। দ্বীনের বাস্তব দীক্ষা মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য মানবসৃষ্ট যত মত- পথ ও পদ্ধতি আছে, তার সবই ব্যর্থ হতে বাধ্য; বরং এটি দ্বীনের সাথে খেলতামাশা ও মশকরার নামান্তর। এই দ্বীনকে মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত করার জন্য আল্লাহর পছন্দনীয় মজবুত মানহাজই অবলম্বন করতে হবে, যার চিত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ফুটিয়ে তুলেছেন এবং যেই পথে মানবতার আধার আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলেছিলেন।

সুতরাং প্রথমে মানুষদের আকিদাহর পাঠ ও দীক্ষা দিয়েই শুরু করতে হবে। তাদের প্রকৃত ইলাহ কে? এই মহাজগতে তাদের বেঁচে থাকা ও অস্তিত্বেরই বা হাকিকত কী? দুনিয়ার জীবনে তাদের প্রতি কী কী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে? কে কে তাদের প্রতি দায়িত্বশীল ও কর্তৃত্ববান? কোন জীবনব্যস্থার ছায়ায় তাদের অবতরণ করা উচিত? গোটা বিশ্বের সাথে তার সম্পর্ক ও আচরণ কেমন হবে? বিশ্বব্যবস্থায় তার অবস্থান ও মর্যাদাগত স্তর কী হবে? এ সবকিছুর পরিচয় জানতে হবে। সংক্ষিপ্ত ভাষায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পরাক্রম, তাঁর ভয়, মহাক্ষমতা ও দাপটের অনুভূতি মানুষের অন্তরের গভীর থেকে গভীরে গেঁথে দেয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছার পথ খুলে দেয়া। আর তাই আমি মানুষের জীবনাচার—যা এই মহান দ্বীনের অমৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত—খুঁজে খুঁজে বের করার পক্ষপাতী নই। যেমন ধরুন, ডান হাতে পান করা, বসে বসে পান করা, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া পরিহার করা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার দিকে যেতে চাই না। কারণ, বিশুদ্ধ আকিদাহর ওপর যার মূল ভিত তৈরি হয়নি এবং ইমানের মহত্বের ওপর যার চরিত্র গঠিত হয়নি, তার পক্ষে এই গুণাবলি বয়ে বেড়ানো ও সার্বক্ষণিক পালন করা সম্ভব নয়।

আমরা মানুষের অন্তরাত্মার স্বীয় অবস্থান থেকে শুরু করব। যেন ছিটকে পরা গভীর খাদ থেকে আমরা সেটাকে টেনে তুলতে পারি। তারপর আমরা তাকে নিয়ে ঊর্ধ্বে চূড়ায় আরোহণ করতে থাকব এবং চুমুকে চুমুকে ইমানের সুধাভাত পেয়ালাপান করাতে থাকব।

আত্মার বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির আরোহণ করা পর্যন্ত তার সঙ্গ দেবো। তার যত দাগ আর কলঙ্ক আছে সব ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবো। এই জগৎ থেকে তাকে অন্য জগতে ফিরিয়ে নেব এবং এখান থেকেই যত্ন- পরিচর্যা ও পরিমার্জনের ধারা শুরু করে দেবো;

যেন ধীরে ধীরে যুবক থেকে পরিণত বয়সে উঠে একটি সুন্দর স্বভাব ও প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং এমন সুদৃঢ় ও মজবুত হতে পারে, যাকে কোনো ভূকম্পনও সরাতে পারে না । এমন অটল-অবিচল, যাকে কোনো দুর্যোগ ও দুর্ভোগও বিচলিত করতে না পারে। তারপর আমরা তার কাছ থেকে তা-ই চাইব, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান। সে হবে সন্তুষ্টচিত্ত, আত্মনিবেদিত ও আত্মপ্রশান্ত। এমন অবস্থায় সে যা করবে তার পুরোটাই হবে কল্যাণকর। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মনোনীত জীবনব্যবস্থার পুরোটাই কল্যাণ আর কল্যাণ। আর এর বাইরে যা কিছু আছে, পুরোটাই অশুভ ও অকল্যাণকর।

فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

'সুতরাং যে আমার পথনির্দেশনা মেনে চলবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না, দুঃখিতও হবে না। আর যে আমার উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত।'১৫

এখন আমি ওই দায়িদের কথা বলব—যারা সর্বসাধারণের সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করেন যে, তাদের জন্য দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই—যাদের সর্বোত্তম ও সন্দেহাতীত কাজ গ্রহণ করা অপরিহার্য। তাদের এমন স্বচ্ছ একটি আয়নার প্রয়োজন যার মাঝে এই মহান দ্বীনের হাকিকত প্রতিবিম্বিত হবে। সেটাকেই তার মৌলনীতি ও শাখাগত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের রক্ত, মাংস ও দেহ-পেশি যেন দ্বীনের—যে দ্বীনের প্রতি আমরা আহ্বান করি—সাথে মিশে যায়। দৈহিক উপাদান ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন আল্লাহ-প্রদত্ত মানহাজে রূপান্তরিত হয়। তারা যেন ওই মানহাজের ওপরই চলে যার দিকে মানুষদের তারা ডাকবে।

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

'এটি মানুষের প্রতি একটি বার্তা, যাতে তারা সতর্ক হতে পারে এবং জেনে নিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ। আর যাতে জ্ঞানী সম্প্রদায় উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। '১৬

---

১৫. তোয়াহা, ২০ : ১২৩-১২৪

১৬. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ৫২

প্রথম অধ্যায়

আকিদাহ ও তাওহিদ পরিচিতি

আকিদাহ বলতে ইমানের ছয়টি রুকনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বোঝায়। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন, (জিবরিল আলাইহিস সালাম) প্রশ্ন করলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইমান কাকে বলে? তিনি উত্তর দিলেন, ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر।

'আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালায়িকাহ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর 'লিকা' বা সাক্ষাতের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, পুনরুত্থানের প্রতি এবং তাকদিরের প্রতি ইমান আনা।'[১৭]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এসেছে, যা ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ»

'আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালায়িকাহ, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাকদিরের ভালোমন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।'[১৮]

---

১৭. সহিহ মুসলিম, ইমান অধ্যায়, হাদিস নং ১০৬

১৮. সহিহ মুসলিম, ইমান অধ্যায়, হাদিস নং ১০২

আভিধানিক অর্থে আকিদাহ

আভিধানিকভাবে عقيدة(আকিদাতুন) শব্দটি عقد থেকে নির্গত, فعيلة-এর গঠনপ্রকৃতিতে ব্যবহার্য। معقودة অর্থে অর্থ হয় রশি বাঁধা, কেনাবেচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, সন্ধি বা চুক্তিপত্র সম্পন্ন করা। يعقده অর্থাৎ রশি, কেনাবেচা ও সন্ধিচুক্তিকে মজবুত ও সুদৃঢ় করা। অঙ্গীকার ও সন্ধিচুক্তিকেও 'আকদ' বলে।'[১৯] সুতরাং আকিদাহ হলো দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ একটি অঙ্গীকারনামা, সুদৃঢ় এক রজ্জু। কারণ, এই আকিদাহ মানুষের অন্তরে গেঁথে যায় এবং গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করে।

শাহাদাতাইন

لا أله الله محمد رسول الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ)—এ দুটো বাক্য এত এত গুরত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি যার ওপর এই মহান দ্বীনের সুস্পষ্ট ধারণা দাঁড়িয়ে আছে। আর এটি এমন অনন্য পথ যা প্রতিটি পথ অনুসন্ধানীকে দারুস সালামে পৌঁছে দেয়,

يَّهْدِيْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এই কিতাব দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথ দেখান, নিজ হুকুমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন।'[২০]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উলুহিয়াতের একত্ববাদ হলো সব মূলনীতির মূলনীতি; বরং এটাই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল নবির ওপর নাযিলকৃত দ্বীনের প্রধান মূলনীতি।

---

১৯. আলকামুসুল মুহিত, আইন অক্ষরাংশ, ১/৫১৩

২০. সুরা আল মায়িদাহ, ৫ : ১৬

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

*আপনার আগে আমি যত রাসুলই প্রেরণ করেছি, তার প্রতি আমি এই ওহিই করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং আমারই ইবাদত করো।'২১

প্রথম সূত্র

এই মৌলনীতি-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—সুবিস্তৃত ও অকৃত্রিম চিত্তে ঘোষণা করে যে, এই জগৎ-মহাজগৎ মহান ও অদ্বিতীয় ইলাহের ইশারা ও ইচ্ছায় ক্রিয়াশীল এবং তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর নির্দেশেই গোটা জগৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, তাঁর কুদরতেই পৃথিবীর সব কাজ, কর্মব্যস্ততা ও নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি পরিচালিত হয়। তাঁর হাতেই প্রতিটা সৃষ্টির প্রতিটা বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছার বাইরে নয়, কোনো বস্তুই তাঁর অভিলাষ থেকে পালাতে সক্ষম নয়।

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

"মুসা বলল—আমার রব তো সেই সত্তা, যিনি প্রতিটি বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দিয়েছেন, তারপর দেখিয়েছেন পথনির্দেশনা।'২২

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى (١) ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ (٢) وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ (٣)

'তোমার সুমহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো, যিনি সবকিছু সৃষ্টি ও সুবিন্যস্ত করেছেন, যিনি সুপরিমিত করেছেন আর পথ দেখিয়েছেন।'২৩

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

'মহিমা সেই পবিত্র সত্তার, যিনি যমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ ও তাদের (মানুষের) এবং তারা যার কথা জানে না, তাদেরও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।'২৪

---

২১. সুরা আম্বিয়া, ২১ : ২৫

২২. সুরা তোয়াহা, ২০ : ৫০

২৩. সুরা আলা, ৮৭ : ১-৩

২৪. সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৩৬

এই সূক্ষ্ম সূত্র যেন কোনোভাবেই আমাদের অন্তর থেকে বিস্মৃত হয়ে না যায় যে, জগতের প্রতিটি বস্তুই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সৃষ্টি।

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

'যিনি প্রত্যেকটি জিনিস চমৎকারভাবে সৃষ্টি করেছেন, আর মানবসৃষ্টি শুরু করেছেন মাটি থেকে।'২৫

দ্বিতীয় সূত্র

এই মহাজাগতিক প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সৈন্য; আদেশ করা হলে পালন করে, আহ্বান করা হলে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়।

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

'তারা কি আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীতে অন্য কারও আনুগত্য তালাশ করে? অথচ আসমান-যমিনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর আনুগত্য করছে। আর তাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।'২৬

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

'এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধোঁয়া। তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন,'তোমরা উভয়ে এসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' তারা বলল, 'আমরা স্বেচ্ছায় এলাম।'২৭

সুতরাং আসমান-যমিন এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুই মহান রব্বুল আলামিনের অনুগত ও বশীভূত সৈন্যদল।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ

'আসমান-যমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর মালিকানাধীন। সবই তাঁর অনুগত।'২৮

---

২৫. সুরা সিজদাহ, ৩২ : ৭

২৬. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৮৩

২৭. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১১

২৮. সুরা রুম, ৩০ ; ২৬

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١)

'আসমান-যমিনের সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় ।'২৯

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

'এমনকিছু নেই যা তাঁর পবিত্রতা ও প্রসংশা বর্ণনা করে না। কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা বর্ণনার ভাষা বুঝতে পারো না।'৩০

সুউচ্চ পর্বতমালা, বিশাল জলরাশি, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল তাঁর সৃষ্টিমাত্র। আর এ সবই হলো আল্লাহর সৈন্যদল।

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

'আসমান-যমিনের বাহিনীগুলো আল্লাহরই। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।'৩১

তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন আগুনকে আদেশ দিলেন, সে তখনই সেই নির্দেশ পালন করল,

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

'আমি বললাম—হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের জন্য শান্তিদায়ক হয়ে যাও।'৩২

যখন পর্বতমালাকে ডাক দিলেন তৎক্ষণাৎ সে সাড়া দিলো,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

'আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম। (বলেছিলাম) হে পর্বতরাজি, তোমরা দাউদের সাথে মিলে আমার মহিমা বর্ণনা করো। আর হে পাখিরা, তোমরাও। আমি তার জন্য লোহাকেও নরম করে দিয়েছিলাম।'৩৩

---

২৯. সুরা হাদিদ, ৫৭ : ১

৩০. সুরা ইসরা, ১৭ : ৪৪

৩১. সুরা ফাতহ, ৪৮ : ৪

৩২. সুরা আম্বিয়া, ২১ : ৬৯; ৩৩. সুরা সাবা, ৩৪: ১০

তৃতীয় সূত্র

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কিছু কিছু মাখলুককে অন্যান্য বান্দাদের অনুগত করে দিয়েছেন।

وَلِسُلَيۡمَـٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَہۡرٌ۬ وَرَوَاحُهَا شَہۡرٌ۬‌ۖ وَأَسَلۡنَا لَهُ ۥ عَيۡنَ ٱلۡقِطۡرِ‌ۖ وَمِنَ ٱلۡجِنِّ مَن يَعۡمَلُ بَيۡنَ يَدَيۡهِ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦ‌ۖ وَمَن يَزِغۡ مِنۡہُمۡ عَنۡ أَمۡرِنَا نُذِقۡهُ مِنۡ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١٢) يَعۡمَلُونَ لَهُ ۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـٰرِيبَ وَتَمَـٰثِيلَ وَجِفَانٍ۬ كَٱلۡجَوَابِ وَقُدُورٍ۬ رَّاسِيَـٰتٍ‌ۚ ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُ ۥدَ شُكۡرً۬ا‌ۚ وَقَلِيلٌ۬ مِّنۡ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ (١٣)

“আর আমি সুলাইমানের জন্য বাতাসকে আজ্ঞানুবর্তী করে দিয়েছিলাম। যার সকাল একমাস, আর বিকেল একমাস।’৩৪ আমি তার জন্য গলিত তামার একটি ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। আর আমি জিনদের তার বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা রবের আদেশে তার অধীনে কাজ করত। তাদের মাঝে কেউ আমার আদেশ অমান্য করলে আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করাব। সুলাইমান যা চাইত, জিনেরা তার জন্য তাই তৈরি করে দিত। যার মাঝে আছে বড় বড় প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজের মতো বড় বড় গামলা ও মজবুত ডেগ।’৩৫

আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে আদেশ করে বলেন,

ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَ‌ۖ فَٱنۢبَجَسَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنً۬ا‌

‘তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো।' ফলে পাথর ফেটে বারোটি ঝরনা ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। ’৩৬

চতুর্থ সূত্র

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতিটি সৃষ্টির জন্য রয়েছে আল্লাহ-প্রদত্ত রীতিনীতি, যার ওপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের সব কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। তারা সেই নীতি থেকে এক আঙুল তো দূরে থাক, এক চুল পরিমাণও বের হতে পারে না। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সে তার

---

৩৪. অর্থাৎ সুলাইমান আলাইহিস সালাম একদিনে বাতাসের সাহায্যে দুমাসের পথ অতিক্রম করতে পারতেন। (অনুবাদক)

৩৫. সুরা সাবা, ৩৪ : ১২-১৩

৩৬. সুরা আরাফ, ৭ : ১৬০

নির্দিষ্ট কক্ষরেখা থেকে যে কক্ষপথে আবর্তন করতে সে নির্দেশপ্রাপ্ত—বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হয় না। যদি সেই পরিমিত রেখা থেকে বিন্দুপরিমাণও আগ বেড়ে যায়, সে নিজে তো ধ্বংস হবেই, সাথে বহুকিছু বিনাশ করে দিয়ে যাবে। চাঁদ ও পৃথিবীরও এরকম নিয়মনীতি রয়েছে।

এই মহাবিশ্বে সব সৃষ্টির জন্য—জিন ও মানুষ ছাড়া—এটিই আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালার কার্যবিধান। হাকিমুল আমর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অনুমতিক্রমে কখনো কখনো মাখলুকের এসব ইবাদত পদ্ধতির বিভিন্ন রহস্যময় দৃশ্য কিছু কিছু বান্দার সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন, ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ নিজ সনদে জাবির ইবনু সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي أَعْرِفُهُ الآنَ»

‘আমি মক্কার একটি পাথরকে চিনি, যেটি আমার জন্মের আগে থেকেই আমার প্রতি সালাম পাঠাত, আমি এখনো সেটাকে জানি।’৩৭

তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়োগব্যথায় খেজুর গাছের কাণ্ডের কান্নার হাদিসগুলো তো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত। এ ধরনের মাখলুকের ইবাদতরীতি কখনো কখনো নবিগণ ছাড়াও অন্যান্য মানুষের সামনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর সালিহ বান্দাদের সামনে ওইগুলো উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ ধরনের আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে, আবু বকর আসসিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আলা ইবনুল হাযরামি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাহরাইন পাঠালেন। তো মরুভূমিতে সফর করতে করতে তাঁরা তীব্র পিপাসা ও পানিসংকটে পড়েন। তাঁদের চোখেমুখে মৃত্যুর ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন তিনি এক জায়গায় নেমে দুই রাকায়াত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে দুয়া করেন—ইয়া হালিম, হে সদা সহনশীল; ইয়া আলিম, হে সর্বজ্ঞাত; ইয়া আলিইয়ু, হে সর্বসমুন্নত; ইয়া আযিম, হে সর্বসম্মানিত; আপনি আমাদের পিপাসা নিবারণ করে দিন। অমনিই পাখির ডানার মতো একখণ্ড বিশাল মেঘ দেখা দিলো, ঝরঝর করে মুষলধারে বৃষ্টি নামতে শুরু করল। তাঁরা সব পাত্র-পেয়ালা ভরে জন্তু-জানোয়ারগুলোকেও তৃপ্ত করালেন।

---

৩৭. সহিহ মুসলিম : ৬০৭৮

তিনি বলেন, 'তারপর আমরা সফর করতে করতে 'দারাইন' গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের ও মুরতাদ বাহিনীর মাঝে একটি সমুদ্র ছিল।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'আমরা একটি নদীর তীরে উপস্থিত হলাম, আমাদের আগে কেউ ঝাঁপিয়ে এই নদী পার হয়নি আর আমাদের পরও অন্য কেউ ঝাঁপিয়ে পেরোবে না। কারণ, সেখানে আমরা কোনো নৌকা দেখতে পাইনি। নৌকাগুলো মুরতাদরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল।' তারপর তিনি দুই রাকায়াত সালাত পড়ে দুয়া করলেন—ইয়া হালিম, হে সদা সহনশীল; ইয়া আলিম, হে সর্বজ্ঞাত; ইয়া আলিইয়ু, হে সর্বসমুন্নত; ইয়া আযিম, হে সর্বসম্মানিত; আপনি আমাদের নদী পার করে দিন। এরপর তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন, 'প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা নদী পেরিয়ে যাও।''

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তারপর আমরা পানির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে নদী পার হয়ে গেলাম। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের কারও পায়ে একটুও পানি লাগেনি, কারও মোজা সামান্যতম ভেজেনি, কারও ঘোড়ার খুরে একটু পানিও স্পর্শ করেনি, অথচ সৈন্যসংখ্যা ছিল চারহাজার।'[৩৮]

এই ঘটনার বিবরণে ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ একটি কবিতা আবৃত্তি করেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ ذَلَّلَ بَحْرهُ - وَأَنْزَلَ بِالْكُفَّارِ إِحْدَى الجَلائِل

دَعَوْنَا الَّذِي شَقَ البِحَارَ فَجَاءَنَا - بِأَعْجَب مِنْ فَلْقِ البحار الأوائل

তোমরা কি দেখোনি?

আল্লাহ তাঁর সাগর বশীভূত করে দিয়েছেন

কাফিরদের ওপর হেনেছেন বজ্রনিনাদ

আমাদের ডাক দিয়েছেন ওই মহান সত্তা,

যিনি সাগর মহাসাগরকে বিদীর্ণ করেছেন

তিনি আমাদের দেখালেন অকল্পনীয় এক কারিশমা,

পূর্ববর্তীদের সমুদ্র ব্যবচ্ছেদের চেয়েও চোখ ধাঁধানো।'[৩৯]

---

৩৮. শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ৯/১৬১-১৬২

ইমানের দ্বিতীয় রুকন

মালায়িকাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের আকিদাহ ও মৌল বিশ্বাসের অন্যতম অংশ। কুরআন আমাদের বলে, মালায়িকাহ আমাদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বান্দাদের আমলের হিসাব আমলনামায় লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ

'প্রত্যেক মানুষের জন্যই আছে একজন তত্ত্বাবধায়ক।'৪০

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

'সে যে কথাই উচ্চারণ করুক (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য), তার কাছেই রয়েছে একজন তৎপর প্রহরী।'৪১

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

'তোমাদের মাঝে যে কথা গোপন করে আর যে তা প্রকাশ করে এবং যে রাতে রাতে লুকিয়ে থাকে আর দিনে অবাধে বিচরণ করে, তাঁর কাছে সবই সমান। মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে রয়েছে একেরপর এক আগমনকারী মালাক। আল্লাহর নির্দেশে তারা তাকে পাহারা দিয়ে রাখে।'৪২

মালায়িকাহ মানুষদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ,তাঁরা মানুষের কৃতকর্মের হিসাব রক্ষা করেন,তাদের আমলনামাগুলো রব্বুল আলামিনের কাছে সোপর্দ করেন। কিছু মালাক আত্মাহরণের দায়িত্বে

---

৩৯. আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৬/১৬১-১৬২ (দারু ইয়াহইয়ায়ুত তুরাস আলআরাবি, ১৯৮৮ ইং)

৪০. সুরা তারিক, ৮৬ : ৪

৪১. সুরা কাফ, ৫০ : ১৮

৪২. সুরা রাদ, ১৩ : ১০-১১

আছেন। কিছু মালাক মুমিন বান্দাদের জন্য ইসতিগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনার আমলে মশগুল আছেন। কিছু মালাক যিকির, তিলাওয়াতের রহমত ও বরকতময় মজলিসে হাযির থাকেন, যেমনটি বহুসংখ্যক সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে দুজন দুজন করে তত্ত্বাবধায়ক মালাক সব মানুষের সাথে সবসময় ঘুরে বেড়ান, সে দুনিয়ার যেখানেই অবস্থান করুক যেখানেই পরিভ্রমণ করুক, তার কাছ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হন না; তবে প্রস্রাব- পায়খানা ইত্যাদি জায়গা ছাড়া।

ইমানের তৃতীয় রুকন

আসমানি কিতাব ও মহাগ্রন্থগুলোর প্রতি ইমান আনয়ন করা আমাদের আকিদাহর অন্যতম রুকন। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সহিফাসমূহের প্রতি ইমান আনা, তাওরাতের ওপর ইমান আনা, যা সাইয়িদুনা মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল হয়েছিল; ইনজিলের ওপর ইমান আনা, যা ইসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল হয়েছিল এবং কুরআনে ওপর ইমান আনা, যা আমাদের নেতা নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল হয়েছে। তবে এখানে দুটি মাসয়ালার প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে,

এক. আমরা বিশ্বাস করি, এই পবিত্র গ্রন্থাবলি মৌলিকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, কিন্তু কুরআন ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের দিকে মানুষের কলঙ্কিত হাত প্রসারিত হয়েছে—কখনো তারা উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠত, কখনো তা বিকৃতির জোয়ারে ভেসে গিয়েছে, কখনো বা অসংযত ব্যাখ্যার শিকার হয়েছে, কখনো তারা আবার কিতাবের হুকুম পুরোই পাল্টে দিয়েছে। পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের সম্পর্কে কুরআনুল কারিম আমাদের এমনই সংবাদ দিয়েছে,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

'যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে, তারপর এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণের জন্য বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে', তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য রয়েছে শাস্তি, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্যও রয়েছে কঠোর শাস্তি।'[৪৩]

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ السِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'তাদের মধ্যে একদল লোক আছে, যারা (আল্লাহর) কিতাব পড়ার সময় (উচ্চারণবিকৃতি ঘটাতে) জিহ্বা বাঁকা করে, যাতে তোমরা তাকে (বিকৃত উচ্চারণকে) কিতাবের অংশ মনে করো; অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে' অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। এভাবে তারা জেনেশুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে।'[৪৪]

সুতরাং এই মহাগ্রন্থ কুরআন—যার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা অনুপ্রবেশ করতে পারে না, সামনে থেকেও না, পেছন থেকেও না—আমাদের সংবাদ দেয় যে, আহলুল কিতাবরা[৪৫] আল্লাহ-প্রেরিত সকল গ্রন্থের সাথে উন্মত্ত খেলায় মেতেছিল। একমাত্র এই কুরআন ছাড়া দুনিয়ার বুকে আল্লাহ-প্রেরিত এমন কোনো কিতাবই নেই, যার প্রতিটি বাক্য ও শব্দ প্রকৃত অবস্থায় অবশিষ্ট আছে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমিই নাযিল করেছি উপদেশবার্তা (কুরআন), আমিই একে হিফাযত করব।'[৪৬]

দুই. এই কুরআনই হলো মানবসভ্যতার জন্য আল্লাহর পছন্দনীয় সর্বশেষ জীবনপদ্ধতি। এটিই সর্বশেষ বিষয়, যার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কিয়ামত দিবসে মানবজাতিকে প্রশ্ন করবেন। আগেকার সমস্ত আসমানি গ্রন্থের রহিতকারী ও সংরক্ষক হিসেবে কুরআন নাযিল হয়েছে।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

'আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা তার আগের কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।'[৪৭]

---

৪৩. সুরা বাকারাহ্, ২ : ৭৯

৪৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৭৮

৪৫. আহলুল কিতাব—কিতাবধারী; আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল। (অনুবাদক)

৪৬ সুরা হিজর, ১৫ : ৯

৪৭. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৮

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

'তিনিই তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সমস্ত বাতিল ধর্ম-মতের ওপর বিজয়ী করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।'৪৮

এই দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গৃহীত হবে না। কুরআনের আদেশ-নিষেধ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করা হবে না।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করলে কখনোই তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।'৪৯

চতুর্থ রুকন

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সমস্ত নবি-রাসুলের ওপর ইমান আনা ইসলামি আকিদাহর অন্যতম অংশ। কেউ যদি কোনো রাসুলের রিসালাত অস্বীকার করে তবে সে দ্বীনের মৌলকাঠামো থেকে বের হয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন ব্যক্তির কোনো ফরয বা নফল আমল গ্রহণ করবেন না।

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

'রাসুলের প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তিনি তার প্রতি ইমান এনেছেন, ইমানদারেরাও (সেসবের প্রতি ইমান এনেছে)। সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাকদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছেন। আর তারা বলে—আমরা তাঁর রাসুলদের মাঝে পার্থক্য-বিভাজন করি না। তারা আরও বলে—আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম; হে রব, আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।'৫০

---

৪৮. সুরা ফাতহ, ৪৮ : ২৮

৪৯. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৮৫

সুতরাং কেউ যদি কোনো নবি-রাসুলের রিসালাতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বার্তাবহনকে প্রত্যাখ্যান করে, সে মূলত সকল রিসালাত ও নবিদের বার্তাবহনকে অস্বীকার করার সাথে সাথে কুরআনকেও অস্বীকার করল। কারণ, কুরআনুল কারিম সকল নবি-রাসুলসহ তাঁদের নবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছে এবং মজবুত ও সুদৃঢ়ভাবে তাঁদের সততা ও সত্যতা ঘোষণা করেছে।

পঞ্চম রুকন

অন্যান্য রুকনের মতো আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখাও একটি মজবুত রুকন এবং অলঙ্ঘনীয় মৌলনীতি; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে যত দ্বীন অবতীর্ণ হয়েছে, এটি তার ভিত্তিপ্রস্তর।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে, আর যারা ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান বা সাবিয়িদের মাঝ থেকে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার; তাদের ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবেনা।'[৫১]

সুতরাং আল্লাহর প্রতি ইমান, আখিরাতের ওপর ইমান ও সৎ কাজ, এই মূলনীতিগুলোসহ উল্লিখিত তিনটি রুকন ছিল আল্লাহর নাযিলকৃত সকল দ্বীনের মূল অবকাঠামো এবং ভিত্তিপ্রস্তর। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন, এর অন্যতম মৌলবিশ্বাস হচ্ছে, দুনিয়া হলো আখিরাতের সেতু আর গোটা মানবজাতিকে অনেকগুলো পর্ব এবং ভয়ঙ্করসব গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করতে হবে; যেমন, মাতৃজঠর থেকে শুরু করে পৃথিবীতে আগমন, সেখান থেকে কবর পর্যন্ত। তারপর পুনরুত্থান, তারপর হাশর, তারপর মিযান, তারপর পুলসিরাত, সেখান থেকে হয়তো অভিশপ্তদের স্থানে, নয়তো চিরস্থায়ী পবিত্র জান্নাতে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সম্মানিত এক স্থান। আর সত্য কথা হলো

---

৫০. সুরা বাকারাহ্, ২ : ২৮৫

৫১. সুরা বাকারাহ্, ২ : ৬২

আখিরাতের প্রতি ইমানই হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে সকল শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিরতার উৎস। এটি এমন এক মজবুত নীতিমালা যা মানুষের চরিত্রকে রক্ষা করে, এমন একটি সতর্ক পাহারাদার যা পৃথিবীতে আল্লাহর আইন ও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়, চোখের দৃষ্টিকে অবৈধ ও অনৈতিক বস্তুর দিকে যেতে নিষেধ করে, খারাপ ও নিষিদ্ধ বিষয়ের চিন্তা-কল্পনা করতে আত্মাকে বারণ করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পছন্দ করেন না এমন একটি শব্দ বা বাক্যও উচ্চারণ না করতে মুখকে বাধ্য করে। কারণ, এগুলোর প্রত্যেকটিই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং মানুষের প্রতিটি শ্বাস-নিশ্বাস, শব্দ-বাক্য এমনকি প্রতিটি নড়াচড়াও আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে।

وَكُلَّ إِنسَـٰنٍ أَلْزَمْنَـٰهُ طَـٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ كِتَـٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا (١٣)

ٱقْرَأْ كِتَـٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤)

‘আমি প্রত্যেক মানুষের আমল তার গলায় বেঁধে রেখেছি। আর কিয়ামতের দিন তার সামনে পেশ করব একটি কিতাব (লিখিত বিবরণ), যা থাকবে উন্মুক্ত। (তাকে বলা হবে) পড়ো তোমার কিতাব। আজ তোমার বিরুদ্ধে হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমি নিজেই যথেষ্ট।’[৫২]

ষষ্ঠ রুকন

ষষ্ঠ রুকন হলো ‘কদর’ বা তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি মানুষের অন্তরাত্মার মূল প্রেরণাদাতা, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে শরিয়াহ পরিপালনের প্রধান অনুপ্রেরণাদানকারী। কদরের যেসব বিষয় সর্বপ্রথম আমাদের ভেতর জেগে উঠে তা হলো, রিযিক ও মউত। আমি এই গ্রন্থের একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছি যে, আমরা ইমান রাখি মানুষের কদর প্রমাণিত- ও সুনির্ধারিত। কোনো ব্যক্তি তার পূর্ণ রিযিক গ্রহণ না করে এবং হায়াত পরিপূর্ণ না করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় না। কোনো ব্যক্তি তার তাকদির-নির্ধারিত সময় ছাড়া মৃত্যুবরণ করে না। আর কেউই অন্য কারও রিযিক থেকে বিন্দুপরিমাণ হ্রাস করতে পারে না, চাই হ্রাস-আকাঙ্ক্ষী যত বড় মর্যাদা বা পদমর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তার ক্ষমতা ও দাপট যতই বিস্তৃত ও প্রসারিত হোক না কেন।

---

৫২. সুরা বনী ইসরাইল , ১৭ : ১৩-১৪

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারে না। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান (তাহলে কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না)। তিনি সব বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।'৫৩

মনে রাখবেন, সমগ্র দুনিয়াবাসী যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনার উপকার করতে চেষ্টা করে, তবুও তারা তা পারবে না; আল্লাহ যতটুকু নির্ধারিত করেছেন, ততটুকুই তারা পারবে। আবার দুনিয়ার সকল মানুষ মিলে যদি আপনার ক্ষতি করতে উঠেপড়ে লাগে, তবেও তারা সক্ষম হবে না; অতটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ লিখে রেখেছেন। কারণ, তাকদিরের কলম ওঠে গেছে এবং খাতা শুকিয়ে গেছে। হায়াতও সুনির্ধারিত, রিযিকও সুনির্ধারিত। আমরা দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করি, সকল বস্তুর ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও রাজত্ব তাঁরই হাতে। সব বিষয়ই তাঁর কাছে ফিরে যাবে। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সব সৃষ্টিই তাঁর পদানত, সব বিষয় ও ব্যবস্থাভার তাঁর দিকেই ফিরে যায়। ভয়ঙ্করতম যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে এই বিষয়গুলো প্রতিটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, অথচ সে পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে পেছনে রেখে আসে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ভরণপোষণকারী, দায়িত্বশীল ও তত্ত্বাবধায়ক রেখে যায় না। উদাহরণ হিসেবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুই যথেষ্ট। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি যখন রাসুল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সব সামান-পত্র ও অর্থ-কড়ি এনে জমা দেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছি।' তাই তো আমরা দেখতে পাই, জিহাদ-কিতালের আয়াতগুলোর পর্বে পর্বে দৃশ্যে দৃশ্যে আকিদাহ-সম্পর্কিত আয়াত বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত ওইসব আয়াতের মাঝে আলোচিত হয়েছে যেগুলোর মূল ভাষ্য হলো, জীবন ও মৃত্যু কেবল আল্লাহর হাতে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجلاً

'আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না; (মৃত্যু হয়) নির্ধারিত সময়ে।'৫৪

---

৫৩. সুরা আনয়াম, ৬ : ১৭

৫৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪৫

যার হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে এই আকিদাহ গেঁথে যায় সে খুব শক্তিশালী হয়, সে আর নিজেকে অপমানিত মনে করে না। পৃথিবীর মহাশক্তির মুখোমুখি হয়েও কোনো ভয় পায় না। দুনিয়ার মহাশক্তিশালী সম্রাটের ক্ষমতার সামনেও বিন্দুপরিমাণ নমনীয় হয় না। লোভনীয় সম্পদ ও প্রাচুর্যের হাতছানিতেও সে প্রলুব্ধ হয় না। এই আকিদাহই ব্যক্তিকে কর্দমাক্ত নর্দমা থেকে মর্যাদার সুউচ্চে তুলে ধরে। তখন সে এমন এক সুউচ্চ স্থানে অবস্থান করে, যেখান থেকে সে আত্মবিনয়ী হয়ে গোটা পৃথিবীর ওপর চোখ বোলাতে পারে, তার ভেতরে জন্ম নেয় আত্মসম্মানবোধ; কিন্তু ভালোবাসা ও পারস্পরিক হৃদ্যতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে। লোপ পেতে থাকে দাম্ভিকতা-অহংবোধ ও মানুষের প্রতি রূঢ়তা। তখন সে আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে যে, আল্লাহ তাকে যে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, তাদেরও যেন সেই মর্যাদায় আরোহণ করান।

এই আকিদাহর কারণেই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম—-সাহাবা কিরাম— আত্মিকভাবে আখিরাতে বাস করতেন, যদিও তাঁদের দেহ দুনিয়ার জীবনে ঘুরে বেড়াত। যদিও তাঁরা কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীতে হেঁটে চলতেন কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি জান্নাতের ভেতর এবং আখিরাতের হিসাব-নিকাশের প্রতি উঁকি দিত। উদাহরণ হিসেবে এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করাই আমার জন্য যথেষ্ট, যা ওই সম্মানিত কাফেলার প্রতি ইঙ্গিত করবে যে, তাঁরা কীভাবে চিন্তা করতেন, কীভাবে জীবনযাপন করতেন, কীভাবে যমিনে বিচরণ করতেন। ইমাম তাবারানি হারিস ইবনু মালিক

আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নিজ সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে হারিস, আজকের সকালে কী অবস্থায় ঘুম থেকে জেগেছ?' তিনি বললেন, 'আজকে আমি সত্য সত্য মুমিন অবস্থায় জেগেছি।' নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কী বলছ, ভেবেচিন্তে বলো। কারণ, প্রতিটি বিষয়েরই একটি হাকিকত থাকে, তোমার ইমানের হাকিকত কী?' তিনি বললেন, 'আমি আমার হৃদয়কে দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নিয়েছি, রাতকে নির্ঘুমে রাখি (কিয়ামুল লাইলে কাটাই), দিনকে পিপাসিত করে তুলি (সিয়াম পালন করি)। আমি যেন মহান রবের আরশ স্পষ্ট দেখতে পাই, দেখতে পাই জান্নাতিরা একে অপরের সাথে মিলিত হচ্ছে, সাক্ষাৎ করছে। জাহান্নামিরা বিলাপ করছে এবং আত্মচিৎকারে ফেটে পড়ছে।' নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে হারিস, তুমি হাকিকত বুঝতে পেরেছ। সুতরাং তুমি এই হাকিকতের ওপর অটল থাকো।' কথাটি তিনি তিনবার বললেন।'[৫৫]

এই সাহাবি—যার সঠিক আত্মপরিচয় জানার ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দিলেন—এমনসব কথা ব্যক্ত করলেন যা তাঁর আবেগ-অনুভূতি ও হৃদয়ের নান্দনিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁর এমন নান্দনিক আত্মবিশ্বাসী আবেগ অনুভূতি তৈরির পেছনে কী পরিমাণ আমল-আখলাক, মেহনত-মুজাহাদার অবদান ছিল, ওগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তাই তো তিনি যেগুলো দেখতে পেলেন—মহান রবের স্পষ্ট আরশ আযিম, জান্নাতিদের পারস্পরিক দেখা- সাক্ষাৎ, জাহান্নামিদের আর্তচিৎকার—এগুলো কেবল একপলক দেখেই শেষ হয়ে যায়নি। বরং তাঁর দেহে-মনে ছেয়ে থাকা উজ্জীবিত আবেগ-উচ্ছাস ও অনুভূতির—যা তার চালচলন ও আচরণকে বর্ণাঢ্যময় করে তোলে এবং প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করতে থাকে—ছায়ায় তিনি বেঁচে থাকেন, কাজকর্ম করেন, চলাফেরা করেন, পরিশেষে তিনি নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দেন, অতৃপ্ত দিন পার করেন এবং মহান রবের আরশ আযিম স্পষ্ট দেখতে পান।

অসংখ্য কীর্তিমানের মাঝে এটি কেবল একজনের উদাহরণ মাত্র, যা সাহাবা কিরামের হৃদয়ে আকিদাহ ও বিশ্বাসের মর্মার্থ কীভাবে ধারণ হতো এবং রক্তে মাংসে গড়া মানুষের ভেতর কীভাবে গেঁথে গিয়েছিল, তা চিত্রিত করে। তাঁরা যমিনে চলাফেরা করতেন, মাটির ওপর ঘুরে বেড়াতেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের চালচলন ও আচার-আচরণে কুরআনের দ্যুতিই প্রতিবিম্বিত হতো।

চলুন, আমরা হিজরি তৃতীয় শতকের এক কীর্তিমান পুরুষের কথা শুনি। আমরা জানব কীভাবে তিনি এই আকিদাহ ধারণ করতেন। চলুন, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর কাছ থেকেই শুনে আসি। একবার এক লোক তাঁর সাক্ষাতে এসে বলল, 'আমাকে কিছু নাসিহাহ করুন।' তিনি বললেন, 'যদি তুমি বিশ্বাস করো যে, আল্লাহই তোমার রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাহলে রিযিকের জন্য এত দুশ্চিন্তা কীসের? যদি জাহান্নাম সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমি এত গুনাহ-প্রবণ কেন? যদি দুনিয়া নশ্বরই হয়ে থাকে তাহলে এখানে আত্মতৃপ্ত কেন? যদি হিসাব-নিকাশ সত্যই হয়, তাহলে সম্পদ সঞ্চয়ের এত প্রবণতা কেন? যদি সবকিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে কাযা ও কাদরের কারণেই হয় তাহলে এত ভয় আর শঙ্কা কেন? যদি মুনকার-নাকিরের সুওয়াল-জাওয়াব সত্যই হয় তাহলে এত ভাব আর অন্যের প্রতি টান কেন?' তারপর লোকটি ইমাম আহমাদের কাছ থেকে বের হয়ে গেল এবং মনে মনে শপথ করল, সে সবসময় আল্লাহর কাযা ও কদরের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। '[৫৬]

---

৫৫. মুজামুত তাবারানি কাবির : ৩৩৬৭

৫৬. আলমাদখাল, ৩/৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকিদাহগত বিচ্যুতির কারণেই মানবসভ্যতার বিপর্যয়

ভ্রান্ত আকিদাহর সাথে তত্ত্বীয় বাস্তবতার দ্বন্দ্ব

এই আকিদাহ নিয়ে আমরা সামনে যত দীর্ঘ আলোচনা করব, সেখানে এমনকিছু সূক্ষ্ম আলোচনা আছে, যেগুলো আমাদের অন্তর থেকে কোনোভাবেই যেন হারিয়ে না যায়,

(১) এই আকিদাহ আল্লাহ-প্রদত্ত। এটি মানবসভ্যতার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত মানহাজ।

(২) পুরো শরিয়াহ এই আকিদাহর ভিত্তিমূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এটিই মানবজাতির কল্যাণের একমাত্র মাধ্যম ।

(৩) একমাত্র এই আকিদাহই মানবজীবনের ব্যবস্থাপনায় আত্মিক ও দৈহিক বিধানের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেছে, মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে এবং দ্বীনি নিযামে ইবাদত ও আমলের মাঝে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে। উস্তায সাইয়িদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ "আলআদালাতুল ইজতিমাইয়াহ' গ্রন্থে এভাবেই আলোচনা করেছেন।

(৪) মানুষের সব আমল, সমস্ত আচরণ ও নৈতিকতা হলো আকিদাহর প্রতিফলন, আর আকিদাহই সেগুলোর ভিত্তি।

(৫) যত আমল আছে, ওগুলো যদি আকিদাহর সাথে না মিলে ওগুলোর কোনো মূল্যই থাকবে না।

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَـٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا۟ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَـٰلُ ٱلْبَعِيدُ ١٨

'যারা তাদের রবের সাথে কুফরি করে তাদের উদাহরণ হলো, তাদের আমলগুলো যেন ছাইয়ের স্তুপের মতো, যার ওপর দিয়ে ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যায়। তারা তাদের উপার্জন দিয়ে কিছুই করতে পারে না। এটিই সুস্পষ্ট ভ্রান্তি।'৫৭

সুতরাং এই পাঁচটি বিষয় অভিশাপ ও দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তিকামীদের জন্য আলোর মশাল হয়ে থাকবে এবং সৌভাগ্য, নিরাপত্তা ও আত্মপ্রশান্তির পিছুছোটা পরিশ্রান্তদের জন্য সুউচ্চ মিনার হয়ে থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনের বড় একটি জায়গা স্বতন্ত্রভাবে এই আকিদাহর জন্যে নির্ধারণ করেছেন এবং এর জন্য দীর্ঘ একটি সময় ব্যয় করেছেন, যেন তা হৃদয়ের গভীরে গেঁথে যায় এবং আত্মার সাথে মিশে যায়। মাক্কি জীবনের প্রায় পুরোটা অংশ জুড়েই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া কোনো পর্ব বা ঘটনার অবতারণা করা হয়নি। আর এই বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে দ্বন্দ্ব বাধেনি। কারণ, আত্মার পরিচর্যা ও বিনির্মাণের ধারাটি ধীর, জটিল ও দুর্লঙ্ঘ অনুশীলনমূলক একটি কাজ। কখনো কখনো এ কাজ করার জন্যে একটি বিশাল পরিব্যপ্ত সময়ের প্রয়োজন পড়ে, যে সময়ের মাঝে একটি মানবদেহ ও শিশু শরীর বেড়ে ওঠে, অনায়াসেই সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষতায় পৌঁছে যায়।

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

'আমি কুরআনকে ভাগ ভাগ করে অবতীর্ণ করেছি, যেন তা বিরতিসহ মানুষের সামনে পড়তে পারো। আর আমি তা ধাপে ধাপে নাযিল করেছি।'৫৮

সুতরাং পৃথক অনুশীলন এবং একটি দীর্ঘ সময়ের যেমন প্রয়োজন, তেমনিভাবে শরিয়াতের সব বিধিবিধান প্রতিষ্ঠাকরণ ও প্রয়োগকরণে আকিদাহর মজবুতি এবং হৃদয়ের গভীরে ভালোভাবে গেঁথে যাওয়াও অপরিহার্য। আর এ কারণেই মদিনায়ও শরয়ি বিধান অবতীর্ণ হতে বিলম্ব হয়,

---

৫৭. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ১৮

৫৮. সুরা ইসরা, ১৭ : ১০৬

যতক্ষণ না সাহাবা কিরামের—যাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজ কুদরত প্রতিবিম্বিত হওয়ার পর্দা বানিয়েছেন, যাদের হাতে এই মহান দ্বীনের সাহায্যকরণ নির্ধারণ করেছেন—অন্তরে অন্তরে আকিদাহর ভিত তৈরি হয় এবং দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়।

উস্তায আবুল হাসান আলি নাদাবি তাঁর ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলিমদের পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো)'[৫৯] কিতাবের 'ইনহাল্লাতিল উকদাতুল কুবরা' নামক শিরোনামে লিখেছেন, 'এরপর সেই বৃহৎ জটিলতম গিঁটটা নিমিষেই খুলে গেল, অর্থাৎ শিরকি আর কুফরি আকিদাহর গ্রন্থি। সাথে সাথে সব সমস্যা আর দুর্ভোগের গিঁটও খুলে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের সাথে এই আকিদাহগত পরিশুদ্ধির প্রথম সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এরপর প্রতিটি আদেশ-নিষেধের জন্য নতুন আর কোনো যুদ্ধ-সংগ্রামের প্রয়োজন পড়েনি। জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রামেই ইসলামের বিজয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর থেকে সব যুদ্ধবিগ্রহ ও মহাসংগ্রামে বিজয় ছিল তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর তাঁরা মন-মনন ও দৈহিকভাবেও পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাবার পর তাঁরা আর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। রাসুলের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁদের অন্তরেও কোনো অনুযোগ ছিল না। তাঁর কোনো আদেশ-নিষেধের ব্যাপারেও নিজস্ব কোনো মতামত-প্রদানের প্রবণতা তাঁদের ছিল না। যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছিল, ঠিক ওই মুহূর্তে পুরোনো মদের পেয়ালাগুলো তাঁদের আঙুলের ডগায় ডগায় শোভা পাচ্ছিল, কিন্তু কুরআনের আয়াত তাঁদের মদ ও মদের পেয়ালার মাঝে এবং মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা ঠোঁট আর উত্তেজিত হৃদয়ের মাঝে পর্দা টেনে দেয়। মদের সব পাত্র আর বড় বড় শরাবদানিগুলো যখন ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, পুরো মদিনার অলিগলি পথঘাট ভেসে যায়।'[৬০]

---

৫৯. আমি গ্রন্থটির গুরুত্ব ও মূল্যায়ন নিয়ে কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। তাই বলছি, প্রতিটি মানুষেরই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা উচিত। আরও ভালো হতো যদি সব প্রকাশনীই বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করত। (লেখক)

৬০. মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমিন, পৃষ্ঠা : ৬৬

فهل أنتم منتهون

(তোমরা মদ পান থেকে বিরত হবে না?)'৬১ _ এই একটি মাত্র বাক্য তাঁদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে বয়ে চলা, হৃদয়ের গভীরে গেঁথে যাওয়া আদি স্বভাবকে নিমিষেই উৎপাটন করে ফেলল। তখন তাঁরা সমস্বরে বলে উঠল, আমরা নিবৃত্ত হলাম, আমরা নিবৃত্ত হলাম; অথচ আমেরিকা এই মদ নিষিদ্ধ করার জন্যে অত্যাধুনিক সব ধরনের মাধ্যম ও উপকরণ ব্যবহার করেছিল। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সব পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনসহ টকশো, আলোচনা-পর্যালোচনা, চিত্র-ব্যঙ্গচিত্র, স্থিরচিত্র, এমনকি নাটক-সিনেমা তৈরি করেছিল মদের ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরার জন্য। এর বিরুদ্ধে ষাট মিলিয়ন ডলালেরও বেশি ব্যয় করেছিল। প্রায় দশ বিলিয়নের মতো লিফলেট ছাপানো হয়েছিল এবং এই আইনটি বাস্তবায়নের জন্য প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়, তিনশো জন নিহত হয়, অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি গ্রেফতার হয়, চারশো মিলিয়ন থেকে শুরু করে চারশো বিলিয়ন সমমূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু এতকিছুর পরও মদ আর মাদকের প্রতি আমেরিকানদের নেশা আশংকাজনক হারে বাড়তেই থাকে। যার কারণে আমেরিকান প্রশাসন ১৯৩৩ সালে মদকে বৈধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। কারণ একটিই, আইন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আকিদাহ থেকেই উৎসারিত হয়। এই মহান দ্বীন-বৃক্ষের উৎসমূল হলো বিশুদ্ধ আকিদাহ। যতক্ষণ না এই উৎসমূল মাটির গভীর থেকে গভীরে শেকড় ছড়াবে, ততক্ষণ এই সুউচ্চ বৃক্ষের ডালাপালার ভার সে বইতে পারবে না। সুতরাং আত্মা ও তার গভীরে ছেয়ে থাকা মজবুত ইমান এবং অন্তঃকরণের অতল থেকে উথলে ওঠা বিশুদ্ধ চিন্তাবিশ্বাস থেকে প্রতিটি আমালুস সালিহ বা সৎকর্ম উৎসারিত হতে হবে।

আকিদাহ সমাজবিনির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর। আর যেকোনো সুবিশাল শক্তিশালী ভবনের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর এবং মাটির ভেতরে প্রোথিত মজবুত খুঁটির প্রয়োজন হয়, যেন এর ওপর ভবনটি পোক্তভাবে স্থির হতে পারে। আরও একটি কার্যকারণ দেখা দেয়_ যা এই বাস্তবতা ও প্রক্রিয়া থেকেই প্রকট হয়ে ওঠে সেটি হলো, ভবন ও অট্টালিকা বানানোর আগে ভিত্তিপ্রস্তর উৎসমূলটাকে মজবুত করে নির্মাণ করা, নয়তো পুরো ভবনটিই ধ্বসে পড়তে পারে।

---

৬১. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৯১

তাই, যাদের আমরা এই মহান দ্বীনের দিকে আহ্বান করি অথবা যাদেরকে ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর গড়ে তুলতে চাই, সবকিছুর আগে তাদের ইমানের শিক্ষা দিয়ে শুরু করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, যখন ইসলামের দাবিদার এই প্রজন্মের সন্তানদের হৃদয় থেকে আকিদাহর মৌলিক অর্থই বিস্মৃত হয়ে গেছে। মানুষের হৃদয়ের গভীরে আকিদাহ মজবুতভাবে গেঁথে দেয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানহাজ রেখে গেছেন, প্রতিটি ব্যক্তিকেই সে মানহাজই অনুসরণ করতে হবে। তারপর তাদের শরিয়াতের ফুরুয়ি বা শাখাগত বিষয়গুলো মানতে বলা হবে। সুতরাং মানুষদের বোঝাতে হবে, তাদের রব কে? মহাবিশ্বে মহান আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্ষমতা, দাপট কেমন ও কত অন্তহীন? তিনিই সকল সম্রাটের মহাসম্রাট, তাঁর হাতেই সব বস্তু ও বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও রাজত্ব। তিনিই সব বান্দার ওপর মহানিয়ন্ত্রক ও দাপটশালী। তাঁর দিকেই সব বিষয় ফিরে যায়। তিনিই সর্বস্রষ্টা ও রিযিকদাতা। এই বিষয়গুলো প্রথমেই শিক্ষা দিতে হবে। আমরা যদি প্রথমেই তাদের শরিয়াতের শাখাগত বিষয়গুলো মানতে বলি, বার বার তাকাযা দিতে থাকি, তাহলে এটা হবে আত্মার শুষ্ক মাটিতে শ্যামল ফসলের বীজ অঙ্কুরোদগম করার ব্যর্থ ও অর্থহীন প্রচেষ্টা।

এই আকিদাহর গুরত্ব, এর বিষয়বস্তুর বাস্তবতা ও স্পর্শকাতরতা এবং এর মৌলিকতা ও অযৌগিকতার কারণেই কুরআনে বর্ণিত আকিদাহ সম্পর্কিত অধিকাংশ আয়াতে তালকিন বা দীক্ষাসূচক শব্দ ও (বলুন, সাক্ষ্য দিন)-এর ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন,

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

‘বলুন. আল্লাহ একক, অদ্বিতীয়।’৬২

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون

'বলুন. হে কাফিররা’৬৩

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

‘তোমরা বলো, আমরা ইমান আনলাম আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি।’৬৪

---

৬২. সুরা ইখলাস, ১১২ : ১

৬৩. সুরা কাফিরুন, ১০৯ : ১

এমনিভাবে উসুলপ্রণেতা আলিমগণ আকিদাহর জন্য এমনসব নুসুস শর্ত করেছেন, যেগুলো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং অকাট্যভাবে দলিল হবার উপযুক্ত।'[৬৫]

ইলমুল আকায়িদ বনাম দর্শনশাস্ত্র

দ্বীনি আকিদাহর বৈশিষ্ট্যই এমন যে, তা দিল-দেমাগে গেঁথে যায়। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও তার প্রতি তুষ্ট হয়ে যায়। হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও আলোড়নকে আন্দোলিত করে। জীবনের বাস্তবতায় যত বলন-চলন ও আচার-আচরণ আছে, সবকিছুর ওপর তার আলোর প্রতিফলন ঘটে। সর্বক্ষেত্রে আকিদাহ সবচেয়ে বড় কার্যকরী ও নিয়ন্ত্রণকারী বস্তু, যার প্রভাব ইতিহাসের গতিময়তায় মানবসভ্যতার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে এবং তাদের জীবনের পরিমার্জন ও পরিশুদ্ধকরণে সুস্পষ্ট। যখন থেকে ইসলামি আকিদাহ অবতীর্ণ হয়েছে, তখন থেকেই মানুষের জীবন ও যৌবনে বড় বড় সংস্কার, পরিবর্তন ও বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, যা আপনাদের কাছে অজ্ঞাত কোনো বিষয় নয়। আর ফালাসাফাহ'[৬৬] বা দর্শনশাস্ত্র হচ্ছে মস্তিষ্কের শৌখিন-বিলাস মাত্র, যা মানুষের অলীক স্বপ্ন আর কল্পনার ভেতরই ঘুরঘুর করতে থাকে, এ থেকে সামনে বাড়তে পারে না। এই দর্শনশাস্ত্র মানবসভ্যতাকে এক কদমও সামনে এগিয়ে নিতে পারে না, বরং এর বিরাট অংশ জুড়েই রয়েছে এমনকিছু মতবাদ আর দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি যা কেবল দার্শনিকদের মাথা আর মস্তিষ্কেই ঘুরপাক খায়।

---

৬৪. সুরা বাকারাহ্, ২:১৩৬

৬৫. ইবনু আবদিল বার আলমালিকি রহিমাহুল্লাহ খবরে ওয়াহিদের ব্যাপারে বলেন যে, অধিকাংশ মালিকি ইমামদের মতামত হচ্ছে, খবরে ওয়াহিদের ওপর আমল করা ওয়াজিব হলেও এটি ইয়াকিনের ফায়দা দেয় না। এটাই ইমাম শাফিয়িসহ অধিকাংশ ফুকাহার অভিমত। তাঁদের মতে ইয়াকিনের ফায়দা কেবল ওইসব নসই দেয় যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইয়াকিনি হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং অকাট্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তবে বেশিরভাগ মুহাদ্দিস এবং কিছু কিছু ফকিহ বলেছেন, খবরে ওয়াহিদ আমলকে ওয়াজিব করে এবং ইয়াকিনের ফায়দা দেয়। তাঁদের অন্যতম হলেন আবুল হুসাইন কারাবিসি। এরপর ইবনু আবদিল বার বলেন, 'খবরে ওয়াহিদ দ্বারা আমল করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হলেও এটি ইয়াকিনের ফায়দা দেয় না। [আলমুসওয়াদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ, পৃষ্ঠা : ৫৪২]

৬৬. ইমাম সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানতিকের মতো ফালসাফা নিয়ে মত্ত থাকা হারাম। এটি সালাফুস সালিহ ও বেশিরভাগ গ্রহণযোগ্য মুতাআখখিরিন মুফাসসিরদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

এই দার্শনিকরাই নিজেদের বক্র পথ ও অন্ধকার অলিগলি থেকে উপাদান নিয়ে চিন্তাশক্তি পরিচালিত করে। এর মাঝে অন্তঃকরণের জন্য অনুভূতি ও উচ্ছ্বাসের কোনো উষ্ণতা নেই, হৃদয়ানুভূতির সাথে সুন্দর জীবনের কোনো হাতছানি নেই, জীবনচলার পথে কোনো রৌশনি নেই।

এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে চাইছি। শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি বহুল স্বীকৃত ও পরিচিত, যা ইসলামি ফালসাফাহ বা ইসলামি দর্শনশাস্ত্র নামে পরিচিত। কোনোভাবেই এটা সম্ভব নয় যে, ইসলামি আকিদাহ মানবীয় মাধ্যম-উপমাধ্যমে বর্ণিত হবে এবং মনুষ্য চিন্তাপ্রসূত ও বুদ্ধির মারপ্যাঁচে আল্লাহ-প্রদত্ত ধর্মবিশ্বাস বিবৃত হবে; যেমন মদের প্রভাব-মিশ্রিত পাত্রে পবিত্র দুধ বহন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই আল্লাহর পছন্দনীয় স্বচ্ছ আকিদাহর চিত্র, গঠনপ্রকৃতিকে দর্শনশাস্ত্রের ছাঁচে ও ধাঁচে বিবৃত করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ, এই দর্শন আকিদাহর নির্মল আলোকে নিষ্প্রভ করে দেয় এবং আলোর সঠিক বিচ্ছুরণকে বাধাগ্রস্থ ও স্খলিত করে। এরপর ইসলামের এই স্বচ্ছ আকিদাহ হয়ে পড়ে আর্দ্রতাপূর্ণ বিশুষ্ক—অথচ তা উর্বর- প্রাণস্পন্দিত ছিল—ইতিবাচক চিন্তাবিশ্বাস থেকে পরিণত হয় নেতিবাচক চিন্তাদর্শনে এবং সহজতার বিপরীতে হয়ে ওঠে দুর্বোধ্য ও গ্রন্থিযুক্ত।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

'আমি তো কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?'[৬৭]

ইসলামের জগদ্বিখ্যাত আলিমদের মাঝে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আলিম দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের ছাঁচে আকিদাহকে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। যেমন, হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ আলগাযালি (মৃ. ৫০৫ হি.), ইমামুল হারামাইন আলজুওয়াইনি (৪৭৮ হি.) ও ফখরুদ্দিন আররাযি (৬০৬ হি.)। তবে তাঁদের কাছে প্রথমবারেই এর তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে যায়। এর ফলাফল

যারা একে স্পষ্টভাবে হারাম বলেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন ইবনুস সালাহ, নববিসহ অসংখ্য আলিম। আর এটি হারাম হওয়ার দলিল নিয়ে আমি একটা কিতাব লিখেছি। এমনকি গাযালিও সর্বশেষ একে হারাম বলেছেন। [বিস্তারিত দেখুন, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা : ৪]

৬৭. সুরা কামার, ৫৪ : ২২, ৩২, ৪০

ছিল যে, তাঁদের আত্মবিচ্যুতি প্রায় ঘটেই গিয়েছিল এবং তাঁদের শাস্ত্রীয় মতামতগুলো প্রায় উৎক্ষিপ্ত ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে তাঁরা দর্শনশাস্ত্র থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহ ছোটো একটি বই লেখেন, বইটির নাম ছিল العوام عن علم الكلام (ইলমুল কালাম থেকে সর্বসাধারণদের নিরত করা)। তিনি সেই বইয়ে লিখেছেন,

فلم يكن الكلام في حقي كافيا ولا لدائي الذي أشكوه شافياً

'ইলমুল কালাম আমার জন্য যথেষ্ট হয়নি আর আমার রোগব্যাধিরও—যার জন্য আমি হা-হুতাশ করি—উপশম হয়নি।'

তিনি আরও বলেন,

الحق أن علم الكلام حرام إلا لشخصين

'সত্য কথা হলো, দুই ব্যক্তি ছাড়া ইলমুল কালাম নিয়ে আলোচনা করা হারাম।'[৬৮]

জুয়াইনি রহিমাহুল্লাহ জীবন-সায়াহ্নে এসে এই আফসোসে অনুতাপ ও পরিতাপের আঙুল কামড়ে ধরতেন যে, তিনি ইলমুল কালামের অনুসন্ধান এবং তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটনে অনেক বাড়াবাড়ি করেছেন।

তিনি বলতেন,

عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز

ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني

'তোমরা অক্ষম-অপারগ ব্যক্তিদের মতো (বিনা দ্বিধায়) দ্বীনকে গ্রহণ করো, সত্য যদি সুন্দর কোমল আচরণ দিয়ে আমার সঙ্গ না দেয়, আমার একান্ত ইচ্ছা আমি অক্ষম-অপারগ ব্যক্তিদের দ্বীনের ওপর মরতে চাই। মৃত্যুকালে আমার শেষ পরিণাম যদি তিনি কালিমাতুল ইখলাসের মাধ্যমে সমাপ্ত না করেন, তাহলে দুর্ভোগ ইবনু জুওয়াইনির জন্য।'[৬৯]

ইমাম রাযি রহিমাহুল্লাহ বলতেন,'জ্ঞান-বুদ্ধির অগ্রগতির শেষ হলো বন্ধ্যাত্ব ও নিষ্ফল কর্ম জগৎবাসীর কর্মতৎপরতার শেষ স্তর হলো ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা, এই দীর্ঘ জীবনে তথ্যানুসন্ধান ছাড়া

---

৬৮. ফাইসালুত তাফরিকাহ বাইনাল ইসলামি ওয়ায যানদাকাহ, পৃষ্ঠা: ৯০

কিছুই অর্জন করিনি কিছু প্রশ্ন আর অভিযোগের স্তুপ ছাড়া কিছুই সঞ্চয় করিনি।'[৭০] 'আলমিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থের রচয়িতা ইমাম শাহরাস্তানি বলেন,

'দুনিয়ার বহু প্রতিষ্ঠান ও অনুষদ আমি ঘুরে দেখেছি, চোখ বুলিয়েছি ওইসব শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চারদিকে, আমি দেখেছি কেবল উদ্ভ্রান্ত লোকের হাত খুঁতনির পরে রাখা, কিংবা পরিতাপের দন্তে ঘাত-প্রতিঘাতকারী!'[৭১]

হ্যাঁ, এই তিনজন কীর্তিমান পুরুষ ইলমুল কালাম থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু কখন? যখন যুক্তিবিদ্যা ও গ্রীকদর্শন—যা বিভিন্ন রকমের পৌত্তলিক শ্লোক আর উপাখ্যানে ভরপুর এক জলাশয়—নিজেদের আকিদাহ কদর্য করে তুলেছিলেন। আর কীভাবেই বা সম্ভব, মহান রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি পরিশুদ্ধ আকিদাহ এমনসব চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে বিবৃত হবে, যা পৌত্তলিকতায় আকণ্ঠ ডুবে আছে, প্রতিমা-বিশ্বাসে কদর্য হয়ে আছে। এমনটি হওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই মহান ইমামগণ ছিলেন ইলমুল উসুলের অসম্ভব প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব, তাই তাঁরা সকল মৌলনীতি যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁরা মৌলনীতিগুলো আরও জটিল ও দুর্বোধ্য করে তোলেন। আর উসুলগুলো হয়ে ওঠে শুষ্ক ঠনঠনে, অথচ সেগুলো ছিল কত সরল সহজ এবং বোধগম্য! আমার কথায় যদি আপনাদের সন্দেহ হয়, তাহলে ইমাম শাফিয়ি রহিমাহুল্লাহর 'রিসালাহ'টি পড়ে দেখুন, কিতাবটির সারল্য সহজতা ও স্বাভাবিকতার প্রতি লক্ষ করুন। আপনি যদি একান্তভাবেই আগ্রহী হন, তাহলে সেই রিসালাহর সাথে অন্যান্য কিতাব—যেমন ইমাম সুবকির লেখা 'জাময়ুল জাওয়ামি' ও ইমাম কামাল ইবনুল হুমামের লেখা 'আততাহরির'-এর সাথে—মিলিয়ে দেখুন, তাহলে দেখতে পাবেন কত বিশাল পার্থক্য এবং কেমন দূরত্ব।

আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত লাগে, এখনো এই যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র বিশেষভাবে পাঠদান করা হয় আর দলিল দেয়া হয়, এগুলো নাকি উসুল ও আকিদাহর জন্য খুবই জরুরি। আল্লাহ-প্রদত্ত আকিদাহ —যা মানুষের সামনে বর্ণনা করা এবং বিজয়ী করার দায়িত্ব স্বয়ং কুরআনুল কারিমই

---

৬৯. তালবিসুল ইবলিস, পৃষ্ঠা : ১০৪-১০৫

৭০. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা : ৭

৭১. প্রাগুক্ত

নিয়েছে—অবশ্যই সরল, সহজ, অকৃত্রিম হতে হবে। তাই তো মানবীয় চিন্তাপ্রসূত কোনো মাধ্যম-উপমাধ্যম দ্বারা এই আকিদাহ বর্ণিত হওয়া বৈধ নয়। ইমাম শাফিয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام

‘শিরক ছাড়া যত কাজ থেকে আল্লাহ বান্দাকে নিষেধ করেছেন, সেগুলোতে লিপ্ত হওয়া যত না নিকৃষ্ট, ইলমুল কালামে লিপ্ত হওয়া তার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট।’৭২

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

لا يفلح صاحب كلام أبدا علماء الكلام زنادقة

‘ইলমুল কালামের চর্চাকারী কখনোই সফল হবে না। কালামশাস্ত্রের বিদ্বানরা যিন্দিক।’৭৩

ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেন, “বিদয়াতি ও প্রবৃত্তিপরায়ণ লোকদের সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য নয়।' তাঁর সঙ্গীদের অনেকে বলেছেন, এ দ্বারা তিনি কালাম-চর্চাকারীদেরই উদ্দেশ্য করেছেন। ’৭৪

মানবীয় যুক্তি-দর্শন থেকে আকিদাহর পরিশুদ্ধি জরুরি

আকিদাহ বিশুদ্ধ করা খুবই জরুরি এবং মানবীয় মতামত ও উপাখ্যান থেকে পরিশুদ্ধ করা অপরিহার্য। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, বরং তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিশুদ্ধ আকিদাহর মৌলকাঠামো ও ভিত্তিপ্রস্তর। যদি এই আকিদাহ ও পরিশুদ্ধবিশ্বাস মানবীয় চিন্তাপ্রসূত মতবাদ ও চিন্তাদর্শন দ্বারা সংক্রমিত হয়ে পড়ে তাহলে সেটি

---

৭২. তালবিসুল ইবলিস, পৃষ্ঠা : ১০২।

তিনি আরও বলেছেন, ‘আমার কাছে ইলমুল কালাম চর্চাকারীদের হুকুম হলো তাদের চাবুক দিয়ে পেটানো হবে এবং গ্রামে গ্রামে ঘোরানো হবে। আর বলা হবে, যে কিতাব ও সুন্নাহ ছেড়ে ইলমুল

কালাম আঁকড়ে ধরেছে এটিই তার শাস্তি।' [প্রাগুক্ত] (অনুবাদক)

৭৩. তালবিসুল ইবলিস, পৃষ্ঠা : ১০২

৭৪. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা : ৬

আর আল্লাহর পছন্দনীয় ও নির্বাচিত মানহাজ থাকে না। আর তার মাঝে এমন কোনো গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকে না যা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের মহাকল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সম্ভবত বিষয়টি নিয়ে আপনি আরও স্পষ্ট হতে চাচ্ছেন। তাহলে চলুন, আমরা ইতিহাসকে জিজ্ঞেস করি এবং তার যুগপরম্পরা থেকে ঘুরে আসি। কুরআন আমাদের বলছে,

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

'(এটি এমন এক গ্রন্থ) যার সামনে কিংবা পেছন থেকে কোনো ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এটি প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'৭৫

নিশ্চয়ই সমস্ত নবি-রাসুল তাওহিদের বিশুদ্ধ আকিদাহ নিয়েই আগমন করেছেন।

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

'আপনার আগে আমি যত রাসুলই পাঠিয়েছি, তার প্রতি আমি এই ওহিই করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতএব, তোমরা আমারই ইবাদত করো।'৭৬

এটি কুরআনের অকুণ্ঠ সত্য সাক্ষ্য। এ পর্যায়ে আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন পাতা অনুসন্ধান করে দেখব ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানরা কীভাবে আকিদাহকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

'ইয়াহুদিরা বলে, 'উযায়ির আল্লাহর পুত্র।' খ্রিষ্টানরা বলে, '(ইসা) মাসিহ আল্লাহর পুত্র।' এ তো স্রেফ তাদের মুখের কথা, তারা তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের মতোই কথা বলছে। আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর। কীভাবে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে!'৭৭

আপনি যদি 'কিতাবুল মুকাদ্দাস' খুলে দেখেন তাহলে দেখবেন, কিতাবটি সব পৌত্তলিক বর্ণনা ও প্রতিমা-চিন্তাবিশ্বাসে আক্রান্ত হয়ে আছে। সেখানে লেখা আছে فنادى الرب الاله آدم وقال له اين انت؟ 'মহান রব আদমকে ডাক দিয়ে বললেন—তুমি কোথায়?'৭৮

---

৭৫. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪২

৭৬. সুরা আম্বিয়া, ২১ : ২৫

৭৭. সুরা তাওবাহ, ৯ : ৩০

৭৮. বুক অব জেনেসিস, ৩ : ৯

ইয়া রব, তারা যা বলে আপনি তা থেকে পূত-পবিত্র এবং মহিমান্বিত! তিনি নাকি জানেন না আদম কোথায়? তাহলে তিনি কেমন ইলাহ? তিনি কি গোপন বিষয় জানেন না? তিনি কি এরচেয়ে গুপ্ত ও রহস্যময় বিষয়ে পরিজ্ঞাত নন? কুরআন কি আমাদের এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি?

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

‘তুমি কি ভেবে দেখোনি যে, আসমান-যমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ জানেন? যেকোনো তিনজনের গোপন কথা হলে, তিনি থাকেন তাদের চতুর্থজন। আর পাঁচজনের হলে তিনি থাকেন ষষ্ঠজন। এরচেয়ে কম কিংবা বেশি হলেও যেখানেই তারা থাকুক তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন। এরপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুই অবগত আছেন।’৭৯

তারা কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এই ঘোষণা শোনেনি,

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

'তোমরা তোমাদের কথা গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ করো, (তিনি তা জানেন, কারণ) তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্যক অবগত।’৮০

তারা আসমানি কিতাব এবং আল্লাহ-প্রদত্ত আকিদাহর মাঝে বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটিয়ে কী অর্জন করল? হাঁ, তারা অভিশাপ আর দুর্ভাগ্য অর্জন করেছে, যা আজ গোটা মানবজাতি বয়ে বেড়াচ্ছে। ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মবেত্তারা যে নিজেদের পক্ষ থেকে মতবাদ ও বক্তব্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, এ বিষয়টি কুরআনুল কারিম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

‘যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে, তারপর এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণের জন্য বলে, ‘এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে', তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য রয়েছে শাস্তি, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্যেও রয়েছে কঠোর শাস্তি।’৮১

---

৭৯. সুরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ৭

৮০. সুরা মুলক, ৬৭ : ১৩

খ্রিষ্টানদের অনুপ্রবেশমূলক কর্মকাণ্ডের মাঝে ছিল ত্রিত্ববাদের অনুপ্রবেশ। তারা মানবীয় চিন্তাপ্রসূত কিছু মতামত ও লোকবিদ্যাকেও—যার উৎস ছিল ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রের সামান্য কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ অনুমান— নিজেদের ধর্মের অবিচ্ছেদ্য গণ্ডিতে অনুপ্রবেশ করায়। ভূবিজ্ঞান নিয়েও তারা বেশ কিছু বই লেখে। তারা সেগুলোর নাম দেয়, النصرانية (খ্রিষ্টীয় ভূবিজ্ঞান)। যারাই এর বিপরীত মতামত দিত তাদেরকেই তারা ধর্মদ্রোহী কাফির আখ্যায়িত করত। যেসব ভূগোলবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিজেদের নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ওপর মতামত পেশ করত, স্বপক্ষে সত্যতার দাবি করত, তারা তাদের খুঁজে খুঁজে বের করত এবং গির্জার ব্যবস্থাপকরা 'তদন্ত পরিষদ' নামে তাদের জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুলতে থাকে। গির্জার ব্যবস্থাপকরা ওই জ্ঞানীগুণী বিদ্বানদের—যারা গির্জার দৃষ্টিতে ছিল ধর্মদ্রোহী নাস্তিক—ধরে ধরে বিভিন্ন বনে-জঙ্গলে, গিরিগুহায় বন্দি করে রাখত। প্রায় তিনলক্ষ খ্রিষ্টানকে—যারা এই সব ভূতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান নিজেদের মাঝে ধারণ ও লালন করত, যা ছিল গির্জার দৃষ্টিতে ধর্মদ্রোহের শামিল—শাস্তি ও দণ্ড প্রদান করে। বত্রিশহাজার মানুষকে জলজ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। তাদের মাঝে ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞানী ব্রুনো ও আরেক বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী গ্যালিলিও। কারণ, সে পৃথিবীর আবর্নতনশীলতার বিশ্বাস প্রচার করত। এ ছাড়াও দণ্ড দেয়া হয় বিজ্ঞানী কোপারনিকাসকে। এক খ্রিষ্টান পণ্ডিত বলে, 'কোনো ব্যক্তির অধিকার নেই যে, সে খ্রিষ্টবাদে (এবং একই সাথে বিজ্ঞানে) বিশ্বাস করবে আবার স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে, বরং অবশ্যই তাকে নিহত বা আগুনে পুড়ে মরতে হবে।'[৮২]

ফলাফল কী হলো? ফলাফল হলো ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে অনিবার্য এক দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে লাগল কীভাবে গির্জার কর্তৃত্ব, দাপট ও চরম সীমালঙ্ঘন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তারা চিন্তা করল প্রথমে গির্জার ঈশ্বরকে দমন করতে হবে, তাহলেই গির্জাকে নির্বাসিনে দেয়া যাবে। কারণ, গির্জার রক্ষকেরা ঈশ্বরের নাম ভাঙিয়েই এসব করছে। প্রথমেই তারা গির্জার বেশকিছু আধ্যাত্মিক সংশোধন প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে, যেমন লুথারের সংস্কার আন্দোলন, ক্যালভিনের আন্দোলন ইত্যাদি। তারা পোপের শিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই শিক্ষাগুলোকে শয়তানের দীক্ষা বলে অবিহিত করে। যেমন, ত্রিত্ববাদের দর্শন, ক্ষমাপ্রাপ্তির টিকিট বিক্রি, অপরাধ-স্বীকারের মাধ্যমে পাপমোচন। এই দুই সংস্কারকর্মী ও পোপের মাঝে ঘোরতর এক লড়াই শুরু হয়েছিল।

---

৮১. সুরা বাকারাহ, ২ : ৭৯

৮২. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহিমাহুল্লাহর অনবদ্য রচনা 'মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমিন'-এর ৫৭১ পৃষ্ঠা। (লেখক)

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে শুরু হয় এক নবযুগের সূচনা। তারা এর নাম দিয়েছে পাশ্চাত্য রেনেসাঁর যুগ বা আকল-বুদ্ধির নেতৃত্বের যুগ। এই সময়েই জন্ম নেয় নেৎশে। সে এসে ঘোষণা করে, ধর্মের ওপর বুদ্ধির রাজত্ব ও কর্তৃত্ব চলবে। তারপর আসে হেগেল। সে এসে ধর্মকে উন্মাদনা ও বিকারগ্রস্ততার সাথে এঁটে দেবার জন্য তৎপরতা চালায়। হেগেলের তত্ত্ব মতে বিবেকের নামই 'আল্লাহ', অথচ তাদের শিরকি কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ পূত-পবিত্র এবং মহামহিমান্বিত। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বৈরিতা চরমে পৌঁছায়; তারা এই যুগের নাম দেয় দৃষ্টবাদের যুগ বা ইন্দ্রিয়শক্তির কর্তৃত্বের যুগ। এই যুগ বাস্তবতা ও প্রকৃতিকে সকল শক্তির উৎস মনে করে এবং বুদ্ধি ও ধর্মেরও ওপর প্রকৃতির কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দেয়। তারা ঘোষণা করে, মানুষের বুদ্ধি হলো প্রকৃতির মানস-সন্তান। তারা বলে, মানুষের পথচলা শুরু হয় নিঃসঙ্গ ও দলবিচ্ছিন্ন অবস্থায় আর শেষ হয় কোলাহলমুখর দলবদ্ধ অবস্থায়। তাই একক ব্যক্তিত্বকে দলবদ্ধতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হবে। প্রকৃতি ও পরিবেশ-বৈচিত্রই মানুষের বিবেকে বাস্তবতার চিত্র এঁকে দেয়।

সেই যুগের বিখ্যাত মনীষী হচ্ছে অগ্যাস্ট কস্ট। আমি বুঝি না কীভাবে প্রকৃতি মানুষের মস্তিষ্কে বাস্তবতাকে খোদাই করে। প্রকৃতি গরু আর বানরের মস্তিষ্কে যে বাস্তবতা আঁকে, কস্ট ও অন্যান্যদের মস্তিষ্কেও কি সেরকম খোদাই চালিয়ে যায়? এই যুগে আসে ডারউইন। সে সময়টাতে সে তার বই On the Origin of Species প্রকাশ করে। The Descent of Man নামে প্রকাশ করে আরও একটি বই। তখনই বিবাদ চরমে পৌঁছে যায়। ডারউইন ও গির্জার অনুসারীদের মাঝে আগুন জ্বলে ওঠে। গির্জার অনুসারীরা তাকে ধর্মদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে। যদিও প্রথম প্রথম বাহ্যত সাধারণের ঝোঁক ছিল গির্জার দিকে, কিন্তু প্রতিনিয়ত চিত্র পাল্টে যেতে লাগল, ডারউইনের পক্ষে জনমত তৈরি হতে লাগল।

মানুষ ধর্মের নামে যে প্রতারণা আর ক্ষতির শিকার হচ্ছিল, তারা একে মুক্তি ও স্বাধীনতার অসাধারণ সুযোগ মনে করে। ডারউইন একসময় প্রাণের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে আল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে বসে। সে বলে, 'প্রাণের ক্রমবিকাশ ও সমৃদ্ধিতে আল্লাহর কর্তৃত্বের ব্যাখ্যা হলো এমন একটি পদার্থকে যুক্তকরণ, যা প্রকৃতির নির্ভেজাল স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাকে অকেজো করে দেয়।' তারপর আসে মার্কস। সে এসে অর্থনৈতিক আলোচনা-পর্যালোচনার ভাঁজে ভাঁজে নাস্তিক্যবাদের ঘোষণা দিতে থাকে। সে বিশ্বাস করত যে, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, চারিত্রিকতা ও পারস্পরিক আচরণ হচ্ছে বস্তুবাদের বিপরীত মেরুর বস্তু; মানবসভ্যতার ইতিহাস হলো খাবার সন্ধানের ইতিহাস। মেনোফেস্টোতে সে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান নির্বাচন করে—মানুষের মৌলিক

চাহিদা হলো খাদ্য, বাসস্থান ও জাতীয়তাবাদের প্রতি আত্মনিবেদন। তার মতে ধর্ম মানবজাতির জন্য আফিম ও বিকারগ্রস্ততা।

তারপর আসে ফ্রয়েড। সে এসে কামজগতে নিজের আওয়াজকে জোরালো করতে থাকে। সে বলে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতিই মানুষকে শাসন করে, পরিচালিত করে। রুহ বা আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। মানবজীবন পুরোটাই কামপ্রবণতার স্ফুরণ মাত্র। এমনকি ধর্ম, স্বভাব-আচরণও মূলত কামতাড়নার ফলাফল। পুত্র সন্তান তার মাকে ভালোবাসে মূলত সুপ্ত কামবাসনা থেকে, কিন্তু সে তার বাবাকে দেখতে পায় যে, বাবা তার মাঝে আর তার মায়ের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে, যার ফলে তার ভেতরে জন্ম নেয় একধরনের বন্ধ্যাত্ব ও ভাবচ্ছিন্নতা। একজন কন্যা শিশুও তার বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয় মূলত কামপ্রবণতার কারণেই, কিন্তু সে তার আর বাবার মাঝে দেখতে পায় যে, মা এসে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। তখন তার মাঝে একধরনের গভীর ভাবাচ্ছন্নতা তৈরি হয়। আর এটি সবারই জানা যে, এই সব কুকীর্তির পেছনে ইয়াহুদিরা কলকাঠি নাড়ছিল। যায়নবাদী ধর্মযাজকদের প্রটোকলের বক্তব্য হলো, 'আমরা ডারউইন, মার্কস ও নেৎশের সফলতাকে তাদের মতামত ও মতবাদকে প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে কার্যকর করেছি। চরিত্র বিনাশকারী এই প্রভাব সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, যা তাদের আবিষ্কার ও মতবাদ থেকে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মন-মস্তিষ্কে—ইয়াহুদি ব্যতীত—বেড়ে ওঠে।'[৮৩]

গির্জা আর এদের মাঝে অব্যাহত যুদ্ধ-সংগ্রামের পর গির্জা আর গির্জার পণ্ডিতরা উপাসনালয়ের চার দেয়ালের ভেতর নির্জীব অবস্থান গ্রহণ করে এবং দাপট আর জৌলুস হারিয়ে নিরাশ হয়ে পড়ে। আর মানুষের মনন থেকে গির্জার ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে যায়; অথচ এই ঈশ্বরের ভক্তিতেই মানুষ গদগদ করত এবং তার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দিত। এর কারণটিও খুব সহজ, আল্লাহ-প্রদত্ত ধর্ম ও এর বিশুদ্ধ আকিদাহ-বিশ্বাস এই যুদ্ধে প্রবেশ করতে পারেনি, বরং নতুন নতুন প্রণীত কিছু অপরিপক্ক মানবীয় মতবাদ ও চিন্তাদর্শন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং এমন জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক বাস্তবতা, সূক্ষ বিশ্লেষণ, অনুসন্ধানের মোকাবেলা করছিল, যার ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত হয়েছিল মজবুত প্রমাণ এবং স্বপ্রমাণিত অভিজ্ঞতার ওপর। উস্তায মুহাম্মাদ আলবাহিয়া বলেন, 'এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলো, আসলে ধর্মের সাথে জ্ঞানের যে বিরোধ সেটি মূলত খ্রিষ্টীয় গির্জাবাদের সাথে মানুষের চিন্তানৈতিকতার বিরোধ। এই বিরোধের কারণ ওইসব পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি,যা গির্জা ও তার পণ্ডিতরা পশ্চিমাদের জীবনে চাপিয়ে দিয়েছিল।'[৮৪]

---

৮৩. আলখাতরুল ইয়াহুদি (ইয়াহুদি প্রটোকল), পৃষ্ঠা : ২৩১, তিউনিসীয় সংস্করণ।

৮৪. সমকালীন ইসলামি চিন্তা, পৃষ্ঠা : ৫৯

এখন গির্জার অবস্থা ও অবস্থান কী? এখন সে মানুষের পেছন পেছন ঘুরঘুর করছে অথবা তাদের পেছনে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চলছে। এখন সে মানুষের কাছে অনুরোধ জানায়, তারা যেন সপ্তাহে কোনো ইশতেহারে বা ধর্মীয় সম্মেলনকেন্দ্রে ঘন্টাখানিক বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য হলেও উপস্থিত হয়। গির্জায় কোনো অনুষ্ঠান করার জন্যে যেকোনো কলেজের দরজায় কোনো একটি ইশতেহার লটকানো থাকবে, তুমি যেকোনো একটি নির্বাচন করতে পারো, রবিবার, পহেলা অক্টোবর, ১৯৫০ ইং, বিকেল ৬ টায়। রাত্রিকালীন হালকা নাস্তার ব্যবস্থা থাকবে, যাদুকরি কিছু খেলা, কিছু হেঁয়ালিপনা, কিছু প্রতিযোগিতা, কিছু প্রমোদায়োজন, নৃত্য পরিবেশনা।

আপনি কি শুনতে পাননি? এখন গির্জা তাদের অনুরোধ জানায়, একটু প্রমোদ ও নৃত্যের আয়োজনে অংশগ্রহণ করে হলেও যেন তারা গির্জায় জড়ো হয়। কিন্তু গির্জার এহেন পরাজয় ও নির্বাসন সত্ত্বেও ধর্ম আর বিজ্ঞানের মাঝে সেই দ্বন্দ্ব ও কোন্দল রয়েই গেছে। এই বিদ্বেষ ও বৈরিতা এখনো মানবজাতিকে ক্লান্তক্লিষ্ট করে তোলে, এখনো তাদের ওপর দুর্ভোগ চাপিয়ে দেয়। এখনো তার প্রতিক্রিয়া আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। আমাদের হাত থেকে, আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের পক্ষ থেকে এখনো আমরা এর মূল্য দিয়ে যাচ্ছি। চরম অস্থিরতা, শৃঙ্খলাহীনতা, ষড়যন্ত্র ও দুর্ভাগ্য বয়ে বয়ে এখনো আমরা মুক্তিপণ দিয়ে যাচ্ছি।

তৃতীয় অধ্যায়

আকিদাহর বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের অবস্থান

ইউরোপে বিকৃত ও অন্তঃসারশূন্য ধর্মবিশ্বাসের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা আমাদের ভূমিগুলোতেও আছড়ে পড়তে থাকে, এমনকি আমাদের সন্তান-সন্ততি ও তরুণ-তরুণীদের আক্রান্ত করতে থাকে। বিশেষত আমাদের সন্তানদের যারা ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়ে বের হয় অথবা এসব অঞ্চলে সেগুলোর শাখা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা শেষ করে, এই ব্যাধি তাদের সংক্রমিত করে।

তারপর তারা দ্বীন-ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও বৈরিতা শুরু করে। তারা মনে করে, আমাদের আকিদাহ-বিশ্বাস এবং জীবনধারাও বিজ্ঞানের সাথে বৈরিতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। তাদের মাঝে এ ধারণাও জন্মায়, আমাদের দ্বীন-ধর্মও গির্জাপ্রকৃতির ধর্মের মতো, যা কিনা বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও আবিষ্কারের সাথে লড়াই ও সংঘর্ষ বাধিয়ে রাখে।

কিন্তু এটি তো ওই রং আর রূপ যা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা তাদের অতীতের তিক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে তৈরি করেছে। সেটি ছিল ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে অন্যায়-অবিচার ও দীর্ঘ বৈরিতার রুদ্ররূপ।

কিন্তু আমাদের সন্তানেরা এই বিবাদের উৎসমূল না ঘেটেই এবং ওই যুদ্ধ- বিগ্রহের কারণ অনুসন্ধান না করেই অধৈর্য হয়ে এগুলো বয়ে বেড়াতে লাগল এবং চারপাশের পরিবেশ নোংরা করতে লাগল। অবশেষে আমরাও পাশ্চাত্যের চিন্তাদর্শন ও তাদের বস্তুতান্ত্রিক তন্ত্রমন্ত্রের পেছনে ছুটলাম এবং পদে পদে, মেপে মেপে তাদের অনুসরণ করতে লাগলাম। এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে প্রবেশ করে তাহলে আমরাও ওতে অনুপ্রবেশ করব!

আমাদের প্রিয় সন্তানেরা কুরআনের এই কথা ভুলেই গেল,

وا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

‘তোমাদের মাঝে থেকে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করবেন।’৮৫

আর তারা যেন কুরআনের এই আয়াত কখনো পড়েই-নি,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

‘বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?’৮৬

এই কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তারা ভুলেই গেল। আল্লাহ ভূত- ভবিষ্যৎ সবই জানেন। নতুন নতুন কেমন প্রজন্ম পাঠাবেন এবং কোন কোন আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটাবেন, তিনি তা জানেন। নতুন নতুন রহস্য উন্মোচন ও উদ্ভাবন করার অর্থই হলো এই মহাবিশ্বে আল্লাহর রীতিনীতি এবং ব্যবস্থাপনা-পদ্ধতির প্রক্রিয়াকে জানা। যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই মহাজাগতিক রীতিনীতি, নিয়ম-পদ্ধতি তৈরি করেছেন তিনিই এই মহাগ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

“তিনি মনগড়া কোনো কথা বলেন না। তিনি তো তাই বলেন, যা তাঁর প্রতি ওহি করা হয়।’৮৭

আল্লাহর মহাজাগতিক রীতিশৈলীর সাথে কুরআনে বর্ণিত জীবনশৈলীর কোনো দূরত্ব বা বিরোধ নেই। কারণ, এই মহাজগৎ হলো আল্লাহর দৃশ্যত চলন্ত গ্রন্থ, আর কুরআন আল্লাহর লিখিত গ্রন্থ। তাই এই দুগ্রন্থের মাঝে কোনো দূরত্ব, বৈপরীত্য ও সংঘর্ষ হতে পারে না। আর এই বিষয়টি আমাদের কাছে তখনই গৃহীত ও যৌক্তিক মনে হবে যখন আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করব এবং এই বিশ্বাস লালন- করব যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, কুরআন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ক্রমধারায় বর্ণিত। যদি কেউ কুরআনের কোনো একটি হরফ বা বর্ণের প্রতিও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠে, সে নিশ্চিত কুফরিতে লিপ্ত হবে।

---

৮৫. সুরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১১

৮৬. সুরা যুমার, ৩৯ : ৯

৮৭. সুরা নাজম, ৫৩ : ৩-৪

দুনিয়ার যেকোনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের সাথে আল্লাহর কুরআনের কোনো আয়াত এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রমাণিত কোনো বিশুদ্ধ হাদিসের দ্বন্দ্ব ও কোন্দল হতে পারে না। আর যদি কখনো বা বাহ্য দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা ও থিউরির সাথে দ্বন্দ্ব ও বৈরিতা দেখা যায়, তাহলে সেই ব্যাখ্যা ও থিউরি বেশি দিন টেকেনি। দেখা গেলো ওইসব মতবাদ ও তত্ত্বের—অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও থিউরি যেগুলোকে আমরা স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মনে করি—প্রবক্তারা বেঁচে থাকা অবস্থায়-ই সেই থিউরি ও মতবাদ থেকে ফিরে এসেছে এবং পরবর্তীরাও তাদের ব্যাখ্যা ও মতবাদের ভুলগুলো প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

আমরা বিংশ শতাব্দীর ওইসব জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞানীর কথা ভুলে যাইনি, যারা চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে, তারা ইসলামের সামনে নিজেদের উপস্থাপন করেছে এবং অলৌকিক বিষয়ের ব্যাপারে দ্বন্দ্ব ও কোন্দলে জড়ানো এড়িয়ে গেছে। তারাও এখন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করতে শুরু করেছে। এমন এক ইচ্ছাশক্তির কথা স্বীকার করছে, যে শক্তি এই মহাবিশ্বসহ তার অভ্যন্তরের সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন। এখন বিজ্ঞানও আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। প্রকৃতিবিদ্যাও গায়িব ও অলৌকিকতার সঙ্গী হয়েছে, কোনো বিরোধ বা সংঘর্ষ নেই। কিন্তু আমরা যখন বলি, বর্তমানে বিজ্ঞানও আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্যবহন করছে এবং আল্লাহর অস্তিত্বহীনতার ধারণাকে অস্বীকার করছে, এ কথা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আন্তরিক সত্যায়নের জন্যে আমরা বৈজ্ঞানিক কথার অবতারণা করছি বরং এই বিজ্ঞানের আগমন ও উৎপত্তিরও আগে আমরা ইমান এনেছি। আমরা রব হিসেবে আল্লাহর ওপর, দ্বীন হিসেবে ইসলামের ওপর এবং নবি ও রাসুল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ইমান এনেছি। অমুক-তমুকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ব্যাখ্যার আগেই আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। কিন্তু এখানে এসব তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের কথা ওই লোকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য আনছি, যারা নিজেদের অস্বীকৃতি প্রমাণ করার জন্য এবং সমাজে নাস্তিক্যবাদ উগড়ল দেবার জন্য বিজ্ঞানমনস্কতার দাবি করে।

এই শতাব্দীতে এমনকিছু লোকের প্রজনন হয়েছে যারা প্রকৃতিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ফাঁকে ফাঁকে নাস্তিক্যবাদ প্রচারের চেষ্টা করছে; কিন্তু এই গণ্ডমূর্খ জানেই না, বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় এবং উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ময়দানে তারচেয়ে বড় বড় রথী-মহারথীরা কী কী স্বীকৃতি দিয়ে গেছে। তবে এ কথাটি তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি সেই বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে থাকে।

সে যদি অনুসন্ধান না করে থাকে তবে আপনি কুরআনের এই অভিব্যক্তি শুনতে পাবেন,

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

'কাফিরদের উদাহরণ হলো, যেমন এক ব্যক্তি কোনো কিছুকে চিৎকার করে ডাকে, কিন্তু যাকে ডাকে সে তার ডাকটা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। তারা বধির, মূক ও অন্ধ; তাই তারা বোঝে না।'[৮৮]

আপনারা যদি এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে, يتجلى في عصر العلم الله (আধুনিক বিজ্ঞানে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ) বইটি পড়ুন। বিশেষ করে বইটিতে জার্মানির ফ্রাংকফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিসেল অরনেস্টের কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

'পৃথিবীর বুকে অস্তিত্বমান মিলিয়ন মিলিয়ন প্রাণিকোষ আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্যবহন করছে, যার প্রমাণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিকভাবেও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর তাই আমি সুদৃঢ় ও সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি।'[৮৯] এ ছাড়াও পড়তে পারেন ক্রেসি মোরিসনের লেখা العام يدعو ألى الايمان (আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাসে বিজ্ঞানের আহ্বান); অথবা পড়তে পারেন উস্তায আব্দুর রাযযাক নাওফালের লেখা ধারাবাহিক সিরিজ - الله والعلم الحديث, (আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আধুনিক বিজ্ঞান), الاسلام والعلم الحديث (ইসলাম এবং আধুনিক বিজ্ঞান), القرآن والعلم الحديث (কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান), طريق الي الله (চলো আল্লাহর পরিচয় জানি), بين الدين والعلم (ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে যোগসূত্র) ইত্যাদি। এখন আমি আমাদের আকিদাহ ও দ্বীনসংক্রান্ত আলোচনায় ফিরব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই মহান দ্বীনের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমি এই কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি, আমিই এই কুরআনকে সংরক্ষণ করব।'[৯০]

---

৮৮. সুরা বাকারাহ্, ২ : ১৭১

৮৯. দেখুন, তাফসির ফি যিলালিল কুরআন, ৭/৩৩২

৯০. সুরা হিজর, ১৫ : ৯

এখন আমরা দেখব এই আকিদাহর ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান কী? আসলে বিশুদ্ধ আকিদাহয় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মহৎ ও মর্যাদাবান হয়ে ওঠেন। তাঁরা এই মহাবিশ্বের সর্বোত্তম অবস্থানে সমাসীন হন। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুই তাঁদের জন্য নত ও বশীভূত করে দিয়েছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে সবই তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'৯১

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যার জন্য মহাকাশ ও ভূমণ্ডলের সবকিছু অবনত করে দিয়েছেন, তার কর্তব্যে নিয়োজিত করেছেন, তাহলে তো সে আসমান-যমিনথেকেও মহামূল্যবান।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'আসমান-যমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে এর কোনো কিছুই আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। এগুলো আমি যথার্থ উদ্দেশ্য নিয়েই বানিয়েছি। কিন্তুতাদের অধিকাংশই জানে না।'৯২

যখন থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানবসৃষ্টির কথা ঘোষণা করলেন তখন মালাকদের আদমের সামনে মাথানত করার আদেশ করলেন, যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর কাছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা কতটুকু। তাই, কুরআনের অনেক আয়াত মানুষকে সম্মান করতে এবং তাদের মর্যাদা বজায় রাখতে উৎসাহপ্রদান করেছে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا

'অবশ্যই আমি মানবজাতিকে সম্মানিত করেছি। তাদেরকে জলে-স্থলে চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি, উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি থেকে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছি এবং আমার সমগ্র সৃষ্টির ওপর তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি।'৯৩

---

৯১. সুরা জাসিয়াহ, ৪৫ : ১৩

৯২. সুরা দুখান, ৪৪ : ৩৮-৩৯

৯৩. সুরা ইসরা, ১৭ : ৭০

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَـٰهُ أَسْفَلَ سَـٰفِلِينَ (٥) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦)

'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি। তারপর আবার সর্বনিকৃষ্টে পৌঁছিয়েছি। তবে তারা ব্যতীত, যারা ইমান আনে ও আমালুস সালিহ করে। তাদের জন্য রয়েছে অন্তহীন পুরস্কার।'৯৪

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, এই মহান দ্বীনের ছায়ায় অবস্থানকারী সব মানুষই সম্মানিত ও মর্যাদাবান। আর তাদের সম্মান রক্ষা করা, মর্যাদা বজায় রাখা আমাদের আকিদাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখন থেকে এই ব্যক্তির ভূমিকা ও দায়িত্বও অনেক ব্যাপক হয়ে গেছে। এই আয়াত—যে আয়াতের মাঝে তার সৃষ্টিসূচনার ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছে—তার দায়িত্ব ও করণীয় নির্বাচন করে দিয়েছে,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

(স্মরণ করো) যখন তোমার রব মালাকদের বললেন,'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধিপ্রেরণ করব।'৯৫

আরেকটি আয়াত তার করণীয়কে কেবল ইবাদতের মাঝেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ (٥٨)

'আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি স্রেফ আমার ইবাদতের জন্যে। তাদের কাছে আমি রিযিক চাই না; আর এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। আল্লাহই তো রিযিকদাতা, ক্ষমতাশালী, মহাশক্তিমান।'৯৬

এখানে إلا মুসতাসনা ব্যবহার করা হয়েছে। এই إلا যখন কোনো না-সূচকের পর আসে, তখন তা পূর্ববর্তী বাক্যের জন্য পরবর্তী বাক্যকে সীমিতকরণ ও সীমাবদ্ধকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যকে ইবাদতকরণ উদ্দেশ্যের মাঝে সীমিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের করণীয় ও দায়িত্বকে ইবাদতের

---

৯৪. সুরা তীন, ৯৫ : ৪-৬

৯৫. সুরা বাকারাহ্, ২ : ৩০

৯৬.সুরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬-৫৮

মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর এ আয়াতটি প্রতিনিয়ত ঘোষণা করছে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবী-বিনির্মাণের জন্যে এবং একে সংশোধন ও পরিশোধন করার জন্যে। আর মানুষই পৃথিবীতে প্রতিনিধি হওয়া এবং এর প্রতিনিধিত্ব করার বেশি উপযুক্ত। সুতরাং বোঝা গেল, পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করা, পৃথিবী-বিনির্মাণ করা এবং এর সংশোধন ও পরিচর্যা করাও ইবাদতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইবাদত রয়েছে জীবনের প্রতিটি অংশে অংশে, পর্বে পর্বে। সালাত একটি ইবাদত, আত্মীয়- স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা একটি ইবাদত, নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা ইবাদত, আবার সালিশ-বিচারে ইনসাফ বজায় রাখাও ইবাদত, নারীদের জন্য লম্বা মুখাবরণ ব্যবহার করা ইবাদত, কেনা-বেচায় সততা বজায় রাখা ইবাদত এবং ইবাদত আল্লাহর পথে লড়াই করা। খানাপিনাও ইবাদত, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আদর- সোহাগ, আবেগ-আহ্লাদ, প্রেম-ভালোবাসাও ইবাদত। এমনকি প্রতিটি বোল-বাক্য, উচ্চারণ, নড়াচড়া ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আবেগ-অনুভূতি, ভয়-শঙ্কা সবই ইবাদত; বরং প্রতিটি ভালো ও উত্তম নিয়াতই ইবাদত। আল্লাহর জন্য কারও সাথে বিদ্বেষ রাখাও ইবাদত। তবে এ সবকিছুর জন্য শর্ত একটিই—সব কাজকর্মই আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। এমনভাবে করতে হবে, যেন সব কাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে ফেরে, মহান রবের জন্যই একনিষ্ঠ হয়। কেননা, ইসলামি আকিদাহয় আমলের মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় হয় বিশ্বাসের প্রভাব থেকে, আমলের ফলাফল থেকে নয়; আমলের ফলাফল তো আল্লাহর হাতে।

মানুষের প্রতিদান আমলের ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং প্রতিদান নির্ভরশীল ব্যক্তির আমলে ইখলাস ও নিয়তের বিশুদ্ধতার ওপর। এ কারণেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মানুষের অবস্থা ও অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যার কারণে মানুষের কর্মের পূণ্য তাদের কর্মের ফলাফলের সাথে যুক্ত নয়; বরং ব্যক্তির আত্মাও তার প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে দূরে থাকে এবং তার কর্মের ফলাফল ভোগের অপেক্ষায় থাকে না। এমনকি তার হাতেই ইসলাম পূর্ণাঙ্গ সাহায্যপ্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকে না। আর এ কারণেই অর্থাৎ ইসলামি আকিদাহয় যেকোনো ভালো উদ্দেশ্যেও ব্যাপকভাবে অবৈধ মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করার বৈধতা নেই। তাই কোনো মুসলিমের জন্য শোভনীয় নয় এবং বৈধও নয় যে, সে মহৎ কোনো লক্ষ্য- উদ্দেশ্যকে অবৈধ ও অনৈতিক কোনো পন্থায় অর্জন করবে। তাই তো কোনো সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি অর্জনের জন্য পরীক্ষায় নকল করা কারও জন্যে বৈধ নয়, যদিও সে মনে করে এর মাধ্যমে সে ইসলামেরই সেবা করবে। কোনো কাফিরের মাল-সম্পদ চুরি করে কোনো মুসলিমকে দান-সাদাকাহ করাও বিধিসম্মত নয়।

ইবাদত ও মুয়ামালাত

এখন আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করতে চাই যে, ইবাদত জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কেই শামিল করে। ইবাদত ও মুয়ামালাতের মাঝে পার্থক্য সম্পর্কে বিষয়টির আলোচনা হবে। যখন থেকে ফুকাহা কিরাম এবং ইসলামের আইনবিশেষজ্ঞরা ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থাদি লেখাশুরু করেন, তখন থেকে এই অধ্যায়টি সবার শেষে সংযুক্ত হয়ে আসছে। অবশ্য এর কারণও রয়েছে। ওই অধ্যায়টি গবেষণা ও শাস্ত্রগত কারণেই সবার শেষে সংযুক্ত হয়েছে। তবে এই সংযুক্তিটি পাঠদানের জন্য অপরিহার্য ছিল, ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্যেই সহজ ও সরল পন্থার অনুবর্তী। কিন্তু এই বিন্যাস-রীতি ইসলামি জীবনে অসংখ্য অশুভ ও দূর্ভাগ্যজনক চিহ্ন রেখে যায়। এই রীতির কারণে মানুষের মন-মগজে বসে যায় আনুষ্ঠানিক বিধিবিধানগুলোই কেবল ইবাদত। কিন্তু মুয়ামালাত, মুয়াশারাত পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন—কোনো ইবাদতই নয়।

মুসলিমদের বড় অংশের ভেতর এই কথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, কেবল সালাতই ইবাদত; কিন্তু আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা এবং সৎ ও কল্যাণের আদেশ করাও যে ইবাদত তারা এটা যেন মানতেই চায় না। কুরআন-হাদিসে যত আদেশ ও করণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং যত বর্জনীয় কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ওইগুলো বাস্তবায়ন করা এবং প্রতিষ্ঠিত রাখাও ইবাদত। জীবনের প্রতিটি কাজ, আচরণ ও অবস্থাও ইবাদত। এমনকি এই জীবনব্যাপী মানুষের প্রতিটি রাগ-অনুরাগ, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আলোড়ন ও আনন্দদোলা সবই ইবাদত। আর এগুলো তখনই ইবাদত হবে, যখন নিয়াত বিশুদ্ধ হবে, ইখলাসের সাথে করা হবে এবং শুধু আল্লাহর জন্যই হবে।

প্রফেসর মুহাম্মাদ আসাদ (লিওপোল্ড উইস), অস্ট্রিয়ায় তাঁর বেশ নাম-খ্যাতি রয়েছে। তিনি খ্রিষ্টবাদ ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন,

‘ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না যে, মানুষের জীবন অন্তঃসারশূণ্য একটি চলন্ত শঙ্খখন্ড এবং পরকালের জীবন কিছু আবছা ও উদ্ভট কল্পনাবিলাসের সমষ্টি; বরং জীবন সম্পর্কে ইসলামের মূল্যায়ন হলো, জীবন মানুষের আত্মবিধৃত ইতিবাচক ঐক্য ও সংহতিব্যবস্থা। আল্লাহর ইবাদত এর বিস্তৃত ও পরিব্যপ্ত অঙ্গনের কারণে মানবজীবনের সকল অর্থ-মর্ম ও সারমর্মকে ইসলামের মাঝে সংযুক্ত করে নিয়েছে। আর এই একটি অনুভূতিই আমাদের বলে, এই পার্থিব জীবনের প্রতিটি পর্বে পর্বে, অধ্যায়ে অধ্যায়ে মানুষ পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারে। ইসলাম এই পূর্ণতা, উন্নতি ও উৎকর্ষতাকে মানুষের দৈহিক ও শারীরিক সব চাওয়া-পাওয়া কামনা-বাসনাকে লোপ ও নির্মূল করা পর্যন্ত প্রলম্বিত করে না এবং ধারাবাহিক পুনর্জন্মের গ্যাঁড়াকলেও ফেলে দেয় না। যেমনটি হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজ ধারণা করে। কিন্তু ইসলামের ইবাদতপদ্ধতি কেবল আমলের ভেতর বিনয় ও আত্মবিস্মৃত হবার মাঝেই

সীমাবদ্ধ নয় যে, কেউ শুধু সালাত সিয়ামের মাঝেই মগ্নতা প্রকাশ করল; বরং ইবাদত মানবজীবনের প্রতিটি কর্মের পর্বে পর্বে অধ্যায়ে অধ্যায়ে ব্যাপৃত, বিস্তৃত হয়ে আছে।’[৯৭]

আকিদাহর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

চলুন আমরা ইসলামি আকিদাহর বেশকিছু বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এবং সমগ্র মানবজীবনে এর প্রভাব ও কার্যকারিতা জেনে নিই,

(১) এই আকিদাহর সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত নির্বাচিত আকিদাহ। এর মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন- বিয়োজন হয়নি এবং হবেও না। আর এ ব্যাপারে আমাদের অন্তর এই তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে যে, এই আকিদাহই আমাদের আত্মার জন্য উত্তম থেকে সর্বোত্তম এবং উৎকৃষ্ট থেকে সর্বোৎকৃষ্ট। এই আকিদাহ যখন কারও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত তখন সৌভাগ্য তার পদচুম্বন করে। আর এই আকিদাহ পরিত্যাগ করলে দুর্ভাগ্য ও বিনাশ তার পিছু নেয়।

ক. সুতরাং এই মহান আকিদাহর ওপর দিয়ে প্রবাহিত শরিয়াতের হুকুম- আহকাম ও বিধিবিধানের নির্ঝরিণী থেকে কল্যাণ, সমৃদ্ধি, পূণ্যময় সাফল্য ও সর্বোত্তম কর্মফল উৎসারিত হয়।

وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

‘যদি জনপদের অধিবাসীরা ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও যমিনের বরকত উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (সত্যকে) অস্বীকার করেছে। তাই আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেছি।’[৯৮]

---

৯৭. মুহাম্মাদ আসাদ, আলইসলাম আলা মুফতারাকিত তুরুক

৯৮. সুরা আরাফ, ৭ : ৯৬

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ

“তারা (ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান) যদি তাওরাত ও ইনজিল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে - নাযিল হয়েছে (কুরআন) সঠিকভাবে মেনে চলত, তারা তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে খাদ্যের যোগান পেত। তাদের মাঝে কিছু লোক আছে সৎপথের অনুসারী, আর অধিকাংশই মন্দ প্রকৃতির।’৯৯

খ. আল্লাহ-প্রদত্ত এই আকিদাহ ও মানহাজ চিরদিন থাকবে। কারণ, এটি সব অপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র এবং সব অন্যায়-অবিচার ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিরাপদ। আসমান-যমিনে আল্লাহর জন্যই তুলনাহীন উপমা এবং সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

‘তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে আসত তাহলে তারা এতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।’১০০

গ. যতদিন আল্লাহ-প্রদত্ত এই আকিদাহ ও মানহাজ থাকবে, ততদিন তা মানুষের ইবাদতের স্বাভাবিক তৃষ্ণা নিবারণ করতে থাকবে, ক্ষুধামন্দাকে নিবৃত্ত করতে পারবে। আল্লাহর অভিপ্রেত মানহাজ ছাড়া কোনো কিছুই তার শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না। কোনো দার্শনিক কাব্যশ্লোকও তার শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না, না পারবে কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা বা রাজকীয় দাপট, আর না কোনো সম্পদের পাহাড় বা ধনৈশ্বর্যের অধৈর্য আকর্ষণ। ক্ষুধার এই প্রাকৃতিক যন্ত্রণা থেকে শুরু করে অতি শক্তি ও সবলতা পর্যন্ত চোখের সামনে বিভিন্ন রকমের ক্লান্তিক্লিষ্টতা, দুর্যোগ ও অশুভ পরিণামের কাছে অকেজো ও বিকল হয়ে পড়ে। এই যে স্ট্যালিন, সে দাবি করত—ইলাহের কোনো অস্তিত্বই নেই, পুরো জীবনটাই হলো বস্তুবাদ- নিয়ন্ত্রিত; আর ধর্ম হলো জোঁকের মতো, যা প্রতিনিয়ত মানবজাতির রক্ত শুষে নেয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতায় সে দুর্বল ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন স্ট্যালিন অনেক পাদ্রীকে জেল থেকে বের করে আনে, যেন তারা তার জন্য সাহায্যপ্রার্থনা করতে পারে। আরেকবার সে ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন সে পাদ্রীর পেছন পেছন নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয় যেন প্রার্থনায় যোগ দিয়ে তার জন্যে ক্ষমা চাইতে পারে।

---

৯৯. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৬৬

১০০. সুরা নিসা, ৪ : ৮২

ঘ. যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ-প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সব মানুষ তার সামনে সমান ও সমমর্যাদার থাকবে। তাকওয়া ও আল্লাহভীতি ছাড়া কোনো অনারবির ওপর আরবির শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষত্ব নেই। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সকল মানুষের স্রষ্টা এবং সবাই তাঁরই বান্দা। তিনি বর্ণবিশেষকে অন্য বর্ণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেন না এবং শ্বেতবর্ণের মানুষকে অশ্বেতবর্ণের ওপর মর্যাদা দেন না; অথচ আমেরিকার বিধানে এ বর্ণবৈষম্যই চলছে। আল্লাহর এই আয়াতের বিধানমতে কোনো পুরুষকেও নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়নি,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘নারী অথবা পুরুষ যে কেউই ইমান আনয়নপূর্বক সৎকর্ম করবে আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে তাদের শ্রেষ্ঠ কাজের পুরস্কার দেবো।’১০১

তবে উক্ত বিধান এই আয়াতের বিধানের বিরুদ্ধে নয়,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

‘পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক; কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর (দায়িত্বের কারণে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর (এ কারণে যে) পুরুষেরা তাদের সম্পদ থেকে (নারীদের জন্য) ব্যয় করে থাকে।’১০২

সুতরাং উভয় আয়াতের পার্থক্যবিধান বুঝতে হবে। আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা কারও সাথেই কোনো বিশেষ খাতির করবেন না। কারণ, নর-নারী সবাই তাঁর সৃষ্টি। কোনো স্তরবিশেষকেও তিনি অন্য স্তরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেন না। যেমন, অভিজাতশ্রেণির লোকদেরকে দাসশ্রেণির ওপর বিশেষ প্রাধান্যদানকরণ। কোনো জাতিগোষ্ঠী ও শ্রেণিবিশেষকে ভিন্ন শ্রেণির মানুষদের ওপর বিশেষ মর্যাদা দেন না।

যেমন, প্রাচীন আর্যশ্রেণি এবং শ্বেতশুভ্র বর্ণের মানুষদেরকে অন্যান্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বদানকরণ (যেমন বলা হয়, জার্মানিরা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি)। সুতরাং এটিই হলো অনন্য ও একমাত্র আকিদাহ, যা মানুষের মাঝে ইনসাফের আলো ছড়ায়। মানুষ এই বিশ্বাসের জগতে এসে বন্ধনের কাণ্ডে দাঁড়াতে পারে যে, তাদের শাসক-শাসিত সবাই সমান ও সমমর্যাদার।

---

১০১. সুরা নাহল, ১৬ : ৯৭

১০২. সুরা নিসা, ৪ : ৩৪

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'তোমার রবের বাণীই সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। কেউ তাঁর বাণী পরিবর্তন করতে পারে না। তিনিই সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।'১০৩

(২) এই মহান আকিদাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'অতএব, আপনি আল্লাহর স্বাভাবিক রীতিতে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে সত্য দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যে রীতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'১০৪

কোনো আকিদাহর স্থায়িত্ব তখনই দৃশ্যমান হয়ে উঠে যখন সেটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে পরম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার সাথে সাথেই ওহি নাযিলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। একে রহিতকরণে আর কোনো কিছুই আসবে না। কোনো অবিশ্বাসী কাফিরও একে বিকৃত বা কলঙ্কিত করতে পারবে না। মানবজাতি বিচরণ করতে থাকবে, উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে থাকবে এবং সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকবে। কিন্তু এই আকিদাহর গণ্ডি স্থিত ও অপরিবর্তনীয় থাকবে। এটি মানবজাতির বিপ্লব-সংগ্রাম, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য একটি আদর্শ ময়দান হয়ে থাকবে। মানুষ যখন এই অপরিবর্তনশীল পরিবৃত্ত থেকে স্খলিত হয়, তখন সে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো ভেসে বেড়াতে থাকে। উদ্ভ্রান্ত তারার পরিণতি বয়ে বেড়ায়। এ পরিণতি তারাটিকে অন্য আরেকটি তারার সাথে সংঘর্ষে বাধ্য করে, পরিশেষে নিজে ধ্বংস হয়, অন্যটিকেও বিধ্বস্ত করে। মানুষের এমন একটি কেন্দ্র প্রয়োজন, যেখানে তারা ফিরে আসবে যেন তারা আত্মপ্রশান্তি লাভ করতে পারে, আরাম ও আত্মতৃপ্তি বোধ করতে পারে; যা তাদের জন্য একটি মানদণ্ড প্রদান করে, যা দ্বারা সব বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা যায় এবং তার প্রস্থ ও ভরও নির্ণয় করা যায়। কিন্তু যারা বলে, জীবনের সব বস্তুরই আধুনিকীকরণ হতে পারে, এমনকি দ্বীন-ধর্ম, চরিত্র-নৈতিকতা এবং জীবনব্যবস্থা পর্যন্ত; তাদের এই ধরনের কথা বড় ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বয়ে আনবে। ফলে কোন বস্তুর ওপর কী হুকুম, কার ওপর কী বিধান, আমরা কখনোই তা নির্ণয় করতে সক্ষম হবো না।

---

১০৩. সুরা আনআ'ম, ৬ : ১১৫

১০৪. সুরা রুম, ৩০ : ৩০

একটি উদাহরণ পেশ করছি, যিনা-ব্যভিচারের কথাই ধরুন। এ কাজটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সকল দ্বীন-ধর্মে হারাম বা নিষিদ্ধ ছিল এবং তার নিকৃষ্টতা সমভাবে সিদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারে দুজন ব্যক্তির মাঝেও কোনো ধরনের দ্বিমত দেখা দেয়নি। সুতরাং আমাদের কাছে যদি এমন কোনো মানদণ্ড থাকে, যা দিয়ে আমরা যিনা-ব্যভিচার মাপতে পারব এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নিতে পারব যে, এটি স্বপ্রমাণিত ঘৃণ্য, জঘন্য ও পরিত্যাজ্য কাজ, তাহলে যিনা- ব্যভিচারের সেই নিকৃষ্টতা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়েই থাকবে। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অন্তরেও গেঁথে যাবে যে, ব্যভিচারের এই বিধান স্থিত ও অপরিবর্তনীয়। তাহলেই তাদের হৃদয় ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও হীনতা নিয়ে বেড়ে উঠবে। কিন্তু কোনো আইনি প্রক্রিয়া ও ধর্মরীতি যদি অস্থিত এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল হয় তাহলে যিনা-ব্যভিচারের কদর্য ও নোংরামি কালের গণ্ডিতেই আটকে থাকবে। পরবর্তীকালে এর কদর্য আর থাকবে না। কারণ, বর্তমানে যারা যৌন স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তুলে তাদের পরিভাষায় (যেমন, ফ্রয়েডের ভাষ্যমতে) ব্যভিচার বায়োলজি বা জীববিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অংশ। এমনিভাবে লজ্জাস্থান আবৃত করে রাখা এবং পোশাক-পরিধেয় দিয়ে শরীরের ত্বক আবৃত করে রাখা—বিশেষ করে নারীশ্রেণির জন্য—ছিল সকল নীতিশাস্ত্র, সকল ধর্ম ও আচারপ্রথায় একটি সহজাত প্রকৃতিগত রীতি ও আচরণবিধি। আর কিয়ামত পর্যন্ত এই নীতি ও আদর্শ বহাল থাকবে। এমনকি সব যুগ ও শতাব্দীতে, সকল উন্নয়নশীল ও সমৃদ্ধিপরিগ্রহণকারী নীতিশাস্ত্রেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবৃত করে রাখা ছিল প্রশংসাযোগ্য রীতি। তারপর আসলো বিংশ শতাব্দী। তখনই পর্দার নান্দনিকতাকে কদর্য প্রথা হিসেবে উপস্থাপন শুরু হলো। এই শতাব্দীর মহারথীরা পর্দাবিধান উচ্ছেদ করার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যমসহ উৎকট গন্ধ বের হওয়া ভেঁপু থেকে আওয়াজ তুলতে লাগল। তাদের ভেঁপুযন্ত্র দিয়ে বিশ্বদরবারে এই পবিত্র আবরণশিল্পের—যাকে তারা উচ্ছেদ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—ওপর প্রতারণা ও হঠকারিতার দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল।

কিন্তু আমাদের স্থায়ী ও চিরন্তন আকিদাহ একটি সঠিক, নির্ভুল মানদণ্ড ও নির্ণায়কযন্ত্র উপস্থাপন করে, যা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ ও নিরূপণ করে। পরিমাপযন্ত্র মাত্র একটি। এই পরিমাপযন্ত্রে প্রতি কিলো ১০০০ গ্রাম। তাই আমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে নিরূপণ করতে যাব, তাকে সেই অতুলনীয় পরিমাপযন্ত্রে রাখব এবং তার বিপরীতে রাখব কিলোমাপকগুলো, যেন আমরা তার ওজন জেনে নিতে পারি। আর এখানে সব মানুষকে ওজন ও পরিমাপ করাটা সঠিক ও নির্ভুল হবে। কারণ, এখানে ওজন একই হবে, যেহেতু পরিমাপযন্ত্রও একটি। পরবর্তীকালে যদি কখনো কোনো দল এসে এই পরিমাপ-গণনার নাম পাল্টিয়ে বলে এই কিলো মূলত কিনতার,'১০৫ তাহলে বিষয়টি এমন দাঁড়াল যে, সে নিজেকে প্রথমবার সত্তর কিলোগ্রাম

ওজন করল, আবার দ্বিতীয়বার মেপে সত্তর কিনতার ওজন পেলো। কিন্তু ব্যক্তি সে একজনই এবং পরিমাপযন্ত্র একটিই রয়ে গেলো। পরিমাপযন্ত্র যদি ভিন্ন ও দ্বৈত ওজনের হয়, তাহলে না মাপ ঠিক হবে, না হিসাব সঠিক আসবে।

সুতরাং মানুষের কাছে কোনো ব্যক্তি হয়তো সম্মানিত, অনুসরণীয় ও মর্যাদাবান হতে পারে, কারণ সে তাদের নির্ণায়কযন্ত্রে অনেক ভারী ও ওজনসমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সে একই ব্যক্তিকে যখন আমরা আল্লাহ-প্রদত্ত সুসংহত নির্ণায়কযন্ত্রে পরিমাপ করব, তখন দেখা যাবে তার কোনো ওজনই নেই। যেমন ধরুন, ওয়ালিদ বিন মুগিরাহ। কুরাইশরা তাকে নেতা ও কর্তৃত্ববান মনে করত এবং বলত,

لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

'কেন এই কুরআন দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফ) কোনো এক প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর নাযিল হয় না?'১০৬

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার ব্যাপারে এবং তার মতো আরও যারা আছে তাদের ব্যাপারে ঘোষণা দিচ্ছেন,

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً (١٠) إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ (١١)

'তুমি এমন ব্যক্তির কথামতো চলো না, যে অধিক শপথকারী, ইতর, কুৎসা রটনাকারী।'১০৭

إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

'যারা কুফরি করে আল্লাহর কাছে তারাই নিকৃষ্ট জীব। অতএব, তারা ইমান আনবে না।'১০৮

এমনকি তার পরামর্শ ও অনুমতি ছাড়া এবং তার কাছ থেকে কোনো উপদেশ ও নাসিহাহ না নিয়ে কুরাইশরা কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্তগ্রহণ করত না; অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে গর্দভ বলে সম্বোধন করছেন এবং মুমিনরাও তাকে গর্দভ বলেই চেনে; বরং নিকৃষ্ট বলে জানে।

---

১০৫. বিশেষ ধরনের ওজন-পদ্ধতি (অনুবাদক)

১০৬. সুরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩১

১০৭. সুরা কালাম, ৬৮ : ১০-১১

১০৮. সুরা আনফাল, ৮ : ৫৫

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

‘তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং এরচেয়েও বেশি বিভ্রান্ত।’১০৯

(৩) আকিদাহর মজবুতি মানুষের সামনে এমন একটি মূলনীতি তৈরি করে দেয়, যার দিকে সব মানুষ ফিরে যায়। তাদের শাসক-প্রশাসক থেকে শুরু করে জনসাধারণও তার সামনে সমান ও সমমর্যাদার হয়ে ওঠে। তখন মানুষ শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করতে থাকে, নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। কারণ, শাসকেরা তাদের ওপর অন্যায়-অবিচার করতে পারে না। কেননা শাসকশ্রেণি জনসাধারণের ওপর যুলুম-নির্যাতন করার আগেই মানুষজন তাদের ওপর প্রশ্ন তুলবে, তুমি কেন আইন ভঙ্গ করছ? আবার জনসাধারণও শাসকশ্রেণিকে বলতে পারবে না, আমরা দেশের সংবিধান ও বিধিনিষেধ জানি না, এগুলো তো নতুন নতুন প্রণীত হয়েছে। যখন থেকে এই মূল উৎসটি রাষ্ট্রের মাঝে মজবুতভাবে প্রতিস্থাপিত হবে, তখন মানুষজন মায়ের আঁচল থেকেই এর পরিচয় ও গুণাগুণ জানতে জানতে বড় হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্রের সব বিধিনিষেধ তাদের হৃদয়ের গভীরে জীবন্ত হয়ে থাকবে, তাদের অনুভব-অনুভূতিতে বিরাজমান থাকবে। আল্লাহ-প্রদত্ত দ্বীনে কোনো শাসক এই উদ্ভট দাবিও করতে পারবে না যে, উদ্ভূত সমস্যা ও জটিল পরিস্থিতিগুলো একেবারেই নতুন, হঠাৎ হঠাৎ সংঘটিত হচ্ছে। এ কথাও বলতে পারবে না যে, সামরিক নীতিমালা ও আইন-কানুনের জটিলতার কারণে আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োগ অনুপযোগী হয়ে গেছে। আর এসব বক্তব্যের আড়ালে রক্তবন্যা বইয়ে দেবে, মানুষের সম্মান, সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হবে কিংবা দ্বীন-ধর্মের সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত করা হবে, এমনটি হবে না।

আজকের দুনিয়ায় মানবরচিত সব মতবাদ ও আইনব্যবস্থার এই দুরাবস্থাই চলছে; বরং সূক্ষ্ম ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে, এগুলো হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতার জীবনব্যবস্থা, যা মূলত তাদের লাগামহীন বাসনা ও চিত্তপ্রমোদের তাড়না থেকে তারা প্রণয়ন করেছে। বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহ বা বিভিন্ন রকমের সামরিক আইন ও সেনা-বিধিনিষেধের মাঝে এর সবচেয়ে স্পষ্ট চিত্র ও উদাহরণ মিলবে। যেমন, প্রতিটি নতুন নতুন বিপ্লব ও বিদ্রোহের পরপরই উদ্ভব হয় বিভিন্ন রকমের আইন-কানুন ও শাসননীতি। প্রত্যেকবারই তৈরি করা হয় ফাঁসির বিভৎস মঞ্চ, হাট-বাজারের খুঁটিতে খুঁটিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয় তরতাজা দেহগুলো। আপনি যখন অন্ধকারের নীরবতায় কমনীয় নারীদের রঙিন দুনিয়ায় নিজেকে আবিষ্কার করেন, ঠিক তখন তরতাজা

---

১০৯. সুরা আরাফ , ৭ : ১০৯

মানুষগুলোকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হয় কিংবা পুরে দেয়া হয় নাইট্রিক এসিডের ব্যারেলে; শেষে গলে তরল পদার্থ হয়ে তারা বের হয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে পরিবারের কাছেই আবার তাদের খোঁজ করা হয়, কারণ তারা তো শেল থেকে পালিয়েছে! এভাবে প্রতিটি বিপ্লবের পরই আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থার ভাঙাগড়া প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এমন-করে রাষ্ট্র তার সম্মানিত কীর্তিমান সন্তানদের হারায়, তার মূল উৎস ও দক্ষ লোকবল নিঃশেষ হয়ে যায়, দেশ তার প্রধান শক্তি মেরুদণ্ড ক্ষয় করে ফেলে। যত দামি দামি উপাদান আছে সব খুইয়ে বসে; অথচ যাদের হারিয়েছে, তারা ছিল জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, উদ্দীপ্ত তরুণদল, বড় বড় বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও দক্ষ-বিদগ্ধ কমান্ডার।

(৪) আল্লাহ-প্রদত্ত আকিদাহর দৃঢ়তা সকল বর্ণ ও প্রকৃতির মানুষদের একটি সংহত সংবিধান ও ব্যবস্থাপনার ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ করে। সেখানে কোনো শাসক বা বিচারকই আইন ও শাসনবিধির ঊর্ধ্বে নয় এবং জনসাধারণও আইন ও শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয় না; বরং সেটি এমন এক আইন ও শাসনব্যবস্থা যা শাসক- প্রশাসক ও কর্তৃত্ববানদের ওপর সমভাবে প্রয়োগ হয়, যেভাবে সাধারণ ও জনসাধারণের ওপর কার্যকর হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হলেন ওই মহান সত্তা,

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায় না, বরং (তারা যা করে সে ব্যাপারে) তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।'১১০

খলিফাহ, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, শাসক-প্রশাসক সবাই আল্লাহর সৃষ্টি। তারা আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর সামনে নিজেদের দাসত্ব প্রকাশ করে, তাঁর পছন্দনীয় ও প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়ন করে। তারা যতদিন আল্লাহর সৃষ্টির গণ্ডিতে জীবন-যাপন করবে, ততদিন আল্লাহর গোলাম হয়ে বেঁচে থাকবে। কখনোই এমন কোনো কর্তৃত্ব ও নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হবে না যে, তাদের কাছে কোনো জবাবদিহি চাওয়া যাবে না বা কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। ইসলামের এই সুন্দর ঐতিহাসিক ঘটনাটিই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। একবার খলিফাতুল মুসলিমিন আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কাযি শুরাইহের কাছে এক ইয়াহুদির বিরুদ্ধে বর্ম চুরির অভিযোগ করেন। কিন্তু কাযি শুরাইহ ইয়াহুদির পক্ষেই রায় দেন।'১১১ এমনিভাবে খলিফাহ হারুনুর রশিদ একবার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাযি আবু ইউসুফের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। খলিফাহ

---

১১০. সুরা আম্বিয়া, ২১ : ২৩

১১১. তারিখুল খুলাফা, ১/২৭৭

জাফর আলবারমাকিকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেন। কিন্তু কাযি আবু ইউসুফ এই বলে সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা দেন যে, 'আমি জাফরকে বলতে শুনেছি সে আপনাকে বলেছে—আপনি আমার মনিব আর আমি আপনার গোলাম। সুতরাং সে যদি আপনার প্রকৃত গোলাম হয়ে থাকে, তাহলে তো মনিবের পক্ষে গোলামের সাক্ষ্যদান বৈধ নয়, আর যদি সে এ ব্যাপারটি মিথ্যা বলে থাকে, তাহলে তো মিথ্যুকের সাক্ষ্যগ্রহণও বৈধ নয়।এখান থেকেই সব সুখ, আনন্দ ও আত্মপ্রশান্তির চাদর সমাজ ও তার চারপাশকে আবৃত করে নেয় এবং শাসক-প্রশাসক থেকে শুরু করে সর্বসাধারণকেও। এর সংস্রবে তারা সৌভাগ্যবান হয়ে ওঠে। কোনো শাসক বা কর্তৃত্ববান ব্যক্তিই আল্লাহর দ্বীন ও আইনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। আর সেখানে নিজের পক্ষ থেকে নতুন কোনো ধর্ম বা মতবাদ দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তন, বিকৃতি ও সংস্কার তো অকল্পনীয় ব্যাপার। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, আইন- কানুনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কার প্রক্রিয়াই রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচার ও অন্যায়-অবিচারের পথকে স্ফীত করে।

তখন মানুষ আইন-কানুনের এই রদবদল এবং সংবিধান সংস্কার ও সংযোজন-বিয়োজনের কারণে এক অস্থির বিষাদময় জীবন পার করে; যা আশপাশের অন্যান্য মানুষ থেকে বিভিন্ন ধরনের আত্মিক দুঃখ-কষ্ট এবং অস্বস্তি ও অস্থিরতার চাইতেও অনেক অধৈর্যের। কারণ, মানুষজন জানে এবং বিশ্বাস করে যে, এই সব উদ্ভট বিধান ও ব্যবস্থাপনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে আসেনি। তাই এর আনুগত্য করা এবং এর সামনে নতিস্বীকার করা ইবাদত তো নয়ই বরং কুরআনুল কারিমে যেসব বিধিবিধান ও আইন-কানুন বর্ণিত হয়েছে তার ওপর মানবরচিত অন্যান্য বস্তুবাদী ব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে প্রাধান্য দেয়া নির্ঘাত কুফরি এবং আল্লাহর প্রতি চরম অবিশ্বাস। কারণ, আপনি আল্লাহর কালামের ওপর মানুষের কালামকে প্রাধান্য দিলেন, বরং মহাবিশ্বের প্রতিপালকের বিধানের ওপর একে প্রাধান্য দিলেন। এমনকি মানবজাতির প্রতিপালকের ওপর মানবজাতিকেই প্রাধান্য দিলেন। আর যে ব্যক্তি এমনটি করল, সে এই মহান দ্বীন থেকে বের হয়ে গেল।

আল্লাহর দ্বীন ও জীবনবিধানের আনুগত্যই ইবাদত। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শাসকের হাতে আইন-কানুন পরিবর্তনের নির্বাহী ক্ষমতা-প্রদানের ফলে যেকোনো উপায়ে নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতে এবং ঘৃণ্যভাবে যৌনলালসা চরিতার্থ করতে সেও নিজ জনগণের লাগামকে উন্মুক্ত করে দেয়, বরং পাশবিক কামনাকে চরিতার্থ করতে তাদের অধিকার দিয়ে দেয়, যা কোনোভাবেই হীন পশুবৃত্তির চেয়ে উন্নত মানসিকতা নয়। বিভিন্ন মতাদর্শ ও শাসনরীতি গজিয়ে ওঠার পেছনে এটিই স্বাভাবিক যৌক্তিক এবং বাস্তবিক কারণ। জনসাধারণের প্রবৃত্তি ও অবাধ ভোগের জন্যে কোনো পাশব-রীতির উদ্ভব ঘটানোর অর্থ হলো, তার অপর প্রান্তে ক্ষমতা ও শক্তির স্বেচ্ছাচারিতার অনিবার্য উদ্বোধন।

চতুর্থ অধ্যায়

আকিদাহর ভিত্তিমূল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সিফাতসমূহের পরিচয়

আমরা জানি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নাম ও গুণসমূহ তাওকিফি; যা গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধু ওহির ওপরই নির্ভর করতে হবে, হয় তা কুরআন থেকে অথবা সুন্নাহ থেকে। ইমাম ইবনু খুযাইমাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৬ হি.) তাঁর 'আত- তাওহিদ' গ্রন্থে বলেন,

فَنَحْنُ وَجَمِيعُ عُلَمَائِنَا مِنْ أَهْلِ الحَجَازِ وَتِهَامَةَ وَاليَمَنِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِضر مَذْهَبُنَا أَنَا نُثْبِتُ لِلهِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ نُقِرُ بِذلِكَ بِأَلْسِنَتِنَا وَنُصَدِّقُ ذلِكَ بِقُلُوبِنَا

'হিজায, তিহামাহ, ইয়ামান, শাম ও মিশরসহ আমাদের সব আলিম-উলামার মাযহাব হলো, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য ওই সব গুণ সাব্যস্ত করি, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং এ বিষয়টি আমরা জবান দিয়ে স্বীকার করি, হৃদয় দিয়ে সত্যায়ন করি।'[১১২]

সহিহাইন ও তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে,

لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَتْر

'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, একটি কম একশতটি। যদি কেউ সেই নামগুলো সংরক্ষণ করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বেজোড় তাই বেজোড়কেই বেশি ভালোবাসেন।'[১১৩]

---

১১২. কিতাবুত তাওহিদ লি ইবনি খুযাইমাহ, পৃষ্ঠা : ২৬

১১৩. বুখারি : ৬৪১০, মুসলিম : ৬৯৮৫; শব্দাবলি বুখারির।

সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নাম নিরানব্বইটির মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। আবু বকর এ ছাড়াও অন্যান্য হাদিসে আরও কিছু নাম বর্ণিত হয়েছে। তবে আল্লাহ ইবনুল আরাবি রহিমাহুল্লাহ শারহুত তিরমিযিতে একদল আহলুল ইলম থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ جَمَعَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالى أَلفَ إِسْمٍ

কিতাব ও সুন্নাহ থেকে তাঁরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একহাজার নাম ও গুণ আহরণ করেছেন।'১১৪

ওইসব নামের মাঝে রয়েছে— الحنان، المنان، البديع، الكفيل ইত্যাদি। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কিছু সিফাত,

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'ধ্বংস হবে না কেবল তোমার মহামহিম ও চিরসম্মানিত রবের চেহারা।'১১৫

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

'যারা তোমার কাছে বাইয়াত করে, বস্তুত তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করে। তাদের হাতের ওপর রয়েছে আল্লাহর হাত।'১১৬

সিফাতের মাসয়ালায় চারটি মাযহাব

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সিফাতের ক্ষেত্রে মানুষ চারটি মাযহাবে বিভক্ত।

১. মুশাব্বিহাহ ও মুজাসসিমাহ

তারা আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করে ঠিকই কিন্তু তারা বলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আমাদের হাতের মতো হাত রয়েছে, আমাদের চোখের মতো তাঁরও চোখ রয়েছে, আমাদের মুখের মতো তাঁরও মুখমণ্ডল রয়েছে। এরা হলো দাউদ আলজাওয়ারিবি, হিশাম ইবনুল হাকাম আররাফিদি। এটি মূর্তিপুজোর মতোই, তাদের এই মতবাদ কুফরি, যা তাদের মুসলিম উম্মাহ থেকে বের করে দেয়। এই আয়াত তাদের বিরুদ্ধে বলে,

---

১১৪.দেখুন, উস্তায হাসানুল বান্নার 'আলআকায়িদ', মাজমুয়াতুর রাসায়িল, পৃষ্ঠা : ৯৮৪

১১৫.সুরা রাহমান, ৫৫ : ২৭

১১৬.সুরা ফাতহ, ৪৮ : ১০

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

"কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন।'১১৭ ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন,

لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ... إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه عن أوصافه ... إن المعطل عايد البهتان من شبه الله العظيم بخلقه ... فهو النسيب لمشرك نصراني أو عطل الرحمن عن أوصافه ... فهو الكفار وليس ذا إيمان

'আমরা আমাদের সিফাতের সাথে তাঁর সিফাত তুলনা করব না, কারণ তুলনাকারী প্রতিমাপুজারি। আমরা কখনোই তাঁর সিফাত থেকে তাঁকে অবমুক্ত করব না, কারণ সিফাত-বিলোপকারী অপবাদের নিমন্ত্রণকারী। যে মহামহিমান্বিত আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যস্থাপন করে সে খ্রিষ্টান মুশরিকদের জ্ঞাতি ভাই, আর যে রাহমানের সত্তাকে তাঁর সিফাত থেকে বিলোপ করতে উদ্যত হয়, সে আল্লাহ-অবিশ্বাসী কাফির, ইমানহারা।'১১৮

২. মুয়াত্তিলাহ ও জাহমিয়াহ

এরা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শুনতে পান না, কথা বলতে পারেন না এবং দেখতেও পারেন না; কারণ, এসব কাজ তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। এই ফিরকাটি নির্ঘাত কাফির এবং মুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজ। সালাফগণ বলেন,

المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما

'মুয়াত্তিলারা অস্তিত্বহীনতার পুজো করে আর মুমাসসিলারা মূর্তির পুজো করে।'১১৯

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শিরকের মূল উৎস তাতিল,'১২০

যার ওপর ভিত্তি করে শিরক মাথাচাড়া দেয়। এই তাতিল তিন প্রকারে বিভক্ত। (১) স্রষ্টাকে সৃষ্টি থেকে তাতিল করা। (২) আল্লাহকে তাঁর পবিত্র নাম, গুণ ও কর্ম থেকে তাতিল করা।

১১৭.সুরা শুরা, ৪২ : ১১

১১৮.আলকাসিদাতুন নুনিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১২০

১১৯.মাজমুয়ুল ফাতাওয়া, ৫/২১৬

১২০. নিষ্ক্রিয়করণ : আল্লাহর কোনো সিফাতকে অস্বীকার করা কিংবা কোনো সিফাতকে অর্থশূন্য করে দেয়া। (সম্পাদক)

(৩) বান্দার ওপর তাওহিদের হাকিকত আবশ্যকের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দার সাথে যে মুয়ামালাহ করেন বা করবেন, তা থেকে আল্লাহকে তাতিল করা।'[১২১]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন,

كلا ولا نخليه عن أوصافه ... إن المعطل عايد البهتان

আমরা কখনোই তাঁর সিফাত থেকে তাঁকে অবমুক্ত করব না, কারণ সিফাত-বিলোপকারী অপবাদের নিমন্ত্রণকারী।'[১২২]

৩. সালাফদের মাযহাব

এই মাযহাবের মূল ভাষ্য হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সিফাতগুলো ওইভাবেই প্রয়োগ করা, যেভাবে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা যখন এ ধরনের আয়াতের মুখোমুখি হন – يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর)'[১২৩]

তখন তাঁরা বলতেন, আমরা হাতকে সাব্যস্ত করি, এর প্রতি ইমান রাখি ও সত্যায়ন করি। কিন্তু আমরা এর কাইফিয়াহ'[১২৪] নিয়ে প্রশ্ন করি না, আবার তাতিলও করি না। ইমাম খাত্তাবি রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৮ হি.) এই মাযহাবের একটি সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন, একখণ্ড সংক্ষিপ্ত মজবুত ভাষ্যে এর ওপর দলিল উপস্থাপন করেছেন। বক্তব্যটি চমৎকার, সুসংক্ষিপ্ত। আমি এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذي فيه حذوه ويتبع مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. وقد يعبرون عنها بقولهم: تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل ومرادهم: إنه

---

১২১. আলজাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা : ৯০

১২২. আলকাসিদাতুন নুনিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১২০

১২৩. সুরা ফাতহ, ৪৮ : ১০

১২৪. ধরন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সিফাতের প্রকৃতি বা রকম। (সম্পাদক)

يجب إثبات الصفات دون التكييف وقد يظن من ينسب لهم أنهم أرادوا التفويض أو أنها من المتشابه، وهذا ظن خاطىء

‘সালাফদের মাযহাব হলো, তাঁরা সিফাতসংক্রান্ত সব আয়াত ও হাদিসকে এর প্রকাশ্য (ظاهر) অর্থের ওপর প্রয়োগ করতেন। সাথে সাথে কাইফিয়াত ও তাশবিহ অস্বীকার করতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সিফাতের ওপর কালামের প্রয়োগ করা মূলত তাঁর মহান সত্তার ওপর কালামের ধারা চালু করার নামান্তর। এ ব্যাপারে আল্লাহর সত্তার মাঝে কালামেরই পদচিহ্ন ধরে চলতে হয়, তাঁর মিসালের পেছনে পড়তে হয়। যেহেতু আল্লাহর সত্তাকে সাব্যস্ত করার মানে আল্লাহর অস্তিত্বকেই সাব্যস্ত করা, তাই তাঁর সিফাত সাব্যস্ত করার মানেও হলো তাঁর অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা। এটি কোনো ধরনের কাইফিয়াত সাব্যস্তকরণ নয়। তাঁরা বিষয়টিকে নিজেদের ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করতেন যে, সিফাতগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই প্রয়োগ হবে। কোনোরকম তাবিলের পেছনে পড়া যাবে না। এ কথার মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, ধরন বর্ণনা করা ছাড়াই আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করতে হবে। সালাফদের দিকে সম্বন্ধকারী কিছু লোক ধারণা করে যে, সালাফরা এই কথার মাধ্যমে তাফবিদ উদ্দেশ্য নিয়েছেন’[১২৫] অথবা তাদের ধারণা, এগুলো মুতাশাবিহাতের অর্ন্তভুক্ত। এ সবই তাদের ভুল ধারণা।’[১২৬]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

و من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه و سلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل

'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ওপর বিশ্বাসের অন্যতম অংশ হচ্ছে, নিজ কিতাবে তিনি নিজেকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তাঁকে গুণান্বিত করেছেন, কোনো প্রকার তাহরিফ, তাতিল, তাকয়িফ এবং তামসিল ছাড়াই এর ওপর ইমান আনা।’[১২৭]

---

১২৫. শব্দের বাহ্য অর্থ না করে অর্থকে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা। (অনুবাদক)

১২৬. রাওদাতুন নাদিয়াহ, পৃষ্ঠা : ৩২ চতুর্থ অধ্যায় ৮৭

১২৭. আলআকিদাতুল ওয়াসিতিয়াহ, পৃষ্ঠা : ৮

আবার কেউ কেউ বলেছেন,

صفات الرب تعالى معلومة من حيث الجملة و الإثبات غير مدركة من حيث الكيف و التحديد

'সামগ্রিকতা ও সাব্যস্তকরণের দিক থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সিফাতগুলো জানা আছে, তবে ধরন নির্ধারণ ও সীমাবদ্ধকরণের দিক থেকে তা একেবারেই অবোধগম্য।'১২৮

তাহরিফ (বিকৃতিসাধন) : কোনো নসকে শব্দগত বা অর্থগতভাবে বিকৃত করা।

তাকয়িফ (ধরন-নির্ধারণ) : كيف শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করা। অর্থাৎ এটি কেমন বা কী ধরনের, এ জাতীয় প্রশ্ন করা।

তামসিল (তুলনাকরণ) : কোনো বস্তুর জন্য অন্য একটি বস্তুকে সাদৃশ্যপ্রদান করা, যে বস্তুটি সবদিক থেকে তার মতো হয়।

তাশবিহ (সাদৃশ্যকরণ) : কোনো একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সাথে সাদৃশ্যস্থাপন করা, তবে সে বস্তুটি কিছু কিছু দিক থেকে তার সাথে সাদৃশ্য রাখে।

ইমাম আবুল কাসিম আললালকায়ি 'উসুলুস সুন্নাহ' গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফাহ রহিমাহুল্লাহর ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন,

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ، الَّتِي جَاءَ بِهَا الثِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ؛ وَلَا وَصْفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ؛ فَمَنْ فَسَّرَ الْيَوْمَ شَيْئًا مِنْهَا فَقَدْ خَرَجَ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ النبي صلى الله عليه وسلم وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَصِفُوا وَلَمْ يُفَسِّرُوا وَلَكِنْ أَفْتَوْا بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ثُمَّ سَكَتُوا

'দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত যত ফুকাহা কিরাম আছেন সবাই একমত পোষণ করেছেন যে, কুরআনের ওপর ইমান আনতে হবে এবং গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সিফাতের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদিস বর্ণনা করেছেন, কোনো ব্যাখ্যা, ভিন্ন কোনো বিশেষণ ব্যবহার ও সাদৃশ্যস্থাপন ছাড়াই ওইসব হাদিসের ওপরও ইমান আনতে হবে। সুতরাং আজকের যামানায় কেউ যদি ওগুলোর

১২৮. শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১২

কোনো ব্যাখ্যা করে, তাহলে সে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথের ওপর ছিলেন তা থেকে বের হয়ে গেছে এবং সাহাবা আজমায়িনের জামায়াতকে ত্যাগ করেছে। কারণ, তারা ভিন্ন কোনো বিশেষণ ব্যবহারও করেননি, ব্যাখ্যাও করেননি; বরং কুরআন- সুন্নাহয় যা আছে তার ওপরই ফাতওয়া দিয়েছেন, তারপর চুপ থেকেছেন।'১২৯

ইমাম আবু হানিফাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وله يد ووجه ونفس كما ذكر الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف

'তাঁর হাত, মুখ ও সত্তা রয়েছে, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারিমে বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে চেহারা, হাত ও সত্তার আলোচনা করেছেন, সেগুলো কোনো ধরনের কাইফিয়াত ছাড়াই তাঁর সিফাত। তাঁর হাতকে কুদরত বা নিয়ামত বলা যাবে না। কারণ, তাতে সিফাতকে বাতিলকরণের শঙ্কা আছে। এই ব্যাখ্যা ও মতবাদ কাদরিয়াহ ও মুতাযিলাদের উদ্ভব; বরং হাত তাঁর সিফাত, তবে কাইফিয়াত ছাড়া।'১৩০

ينزل ربنا الى سماء الدنيا

(আমাদের রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন) '১৩১ এবং ان الله يضع قدمه (আল্লাহ তাঁর পা অবতরণ করান), এ ধরনের নসের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন,

نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا ، ونعلم أن ما جاء نؤمن به الرسول ص حق إذا كان بأسانيد صحاح ولا نرد ،قوله ولا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه بلا حدود ولا غاية ليس كمثله شيء

---

১২৯. শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামায়াহ, পৃষ্ঠা : ১৮৬
১৩০. আল ফিকহুল আকবার, পৃষ্ঠা : ১৬৭-১৬৮; (দারুল কিতাব, বৈরুত, হিজরি : ১৩৯৯)

‘আমরা এর ওপর ইমান আনি, সত্যায়ন করি, তবে এগুলোর কোনো অবস্থা ও কাইফিয়াত নেই, কোনো অর্থও নেই।’১৩২ আমরা এগুলোর কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করি না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন—যদি সহিহ সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়—সবই সত্য। আমরা তাঁর কোনো কথাই প্রত্যাখ্যান করি না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন—সীমা ও পরিসীমা ছাড়াই—তারচেয়ে বেশি ও বাড়িয়ে বর্ণনা করা করা যাবে না। তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই।’১৩৩ ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর)’১৩৪

তখন তিনি নিজের হাতের দিকে ইশারা করতেন; অথবা যখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা)’১৩৫ তখন তিনি নিজের চোখ ও কানের দিকে ইশারা করতেন। কারণ, এই ইশারাকৃত অঙ্গ কেটে দেয়া হবে, এ তো নিজের সাথে আল্লাহকে তুলনা করার নামান্তর। ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

إثبات اليد والوجه حق عندنا لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفه ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على وجه المعقول فصاروا معطلة

---

১৩১. এ ব্যাপারে অসংখ্য সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ সহিহুল বুখারিতে তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে (হাদিস নং : ১১৪৫) এবং ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ তাঁর সহিহ মুসলিমে সালাত অধ্যায়ে (হাদিস নং : ১৮০৮) আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»

‘আমাদের রব প্রতি রাতের তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। এরপর তিনি ডাকতে থাকেন, ‘কে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে দেবো। কে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।' ' (অনুবাদক)

১৩২ এর ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل
আমরা এর কোনো ধরন বর্ণনা করবো না এবং অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিকৃতও করব না। [দারয়ু তায়ারুদিল আকলি ওয়াননাকল, ২/৩১] (অনুবাদক)

১৩৩.কিতাবুল আরশ, পৃষ্ঠা : ১১৫

১৩৪. সুরা ফাতহ, ৪৮ : ১০

‘হাত ও চেহারা সাব্যস্ত করা আমাদের কাছে সত্য। কিন্তু এটি আসল হিসাবেই বিশ্বাস করা হয় এবং তার সিফাতের সাথে সাদৃশ্য মনে করা হয়। সুতরাং কাইফিয়াত বর্ণনা করা থেকে অক্ষম হওয়ার কারণে সিফাতকেও বাতিল করা যাবে না। মুতাযিলারা এই জন্যই পথচ্যুত হয়েছে। তারা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সিফাত সম্পর্কে না বুঝতে পেরে মূল সিফাতগুলোই প্রত্যাখ্যান করে বসে। ফলে মুয়াত্তিলাহগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।’১৩৬

৪. খালাফদের মাযহাব

এই মতের অনুসারীরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে দেহবাদের দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর কিছু কিছু সিফাতকে ব্যাখ্যা করা বৈধ মনে করতেন। তবে তারা এ ব্যাপারে সালাফদের সাথে একমত যে, আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য এমনসব অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিপরীত যা মানুষের মাথায় আসে।

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ তাঁর,دفع شبه التشبيه (সাদৃশ্যবাদের সংশয় নিরসন) গ্রন্থে বলেন, ‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

‘ধ্বংস হবে না কেবল তোমার মহামহিম ও চিরসম্মানিত রবের চেহারা।’১৩৭

মুফাসসিরগণ বলেন, এর অর্থ হলো 'তোমার রব বাকি থাকবেন।' এমনিভাবে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী, يريدونه (তারা আল্লাহর চেহারা কামনা করে)-এর তাফসির করেছেন, (তারা আল্লাহকে চায়)। এমনিভাবে দাহহাক ও আবু উবাইদাহ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু তাঁর চেহারা ছাড়া) আয়াতের তাফসির করেছেন, الا هو অর্থাৎ তিনি ছাড়া।'

ইমাম ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, আয়াতের বাহ্য অর্থ গ্রহণ করা সাদৃশ্যবাদ ও দেহবাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, শব্দের বাহ্য অর্থের জন্যই শব্দটিকে গঠন করা হয়েছে। সুতরাং يد (হাত) শব্দটির হাকিকি অর্থ جارحة বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়া অন্য কিছুই বুঝে আসে না। তিনি বলেন, ‘সালাফদের মানহাজ হচ্ছে, এসব আয়াতের ব্যাপারে সুকুত ইখতিয়ার করা বা চুপ থাকা। তাঁরা কখনোই আয়াতের বাহ্য অর্থ ও মর্ম গ্রহণ করতেন না।’১৩৮

---

১৩৫. সুরা শুরা, ৪২ : ১১

১৩৬. ইদাহুদ দালিল, পৃষ্ঠা : ৪১

১৩৭. সুরা রাহমান, ৫৫ : ২৭

আমাদের মাযহাব

সিফাতের আকিদাহর ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মাযহাবই আমাদের মাযহাব। এ ব্যাপারে আমরা সালাফদের মাযহাবই গ্রহণ করেছি। যার সারমর্ম হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সুমহান সিফাতসহ তাঁর নামগুলো সাব্যস্ত করা এবং একমাত্র তাঁর জন্যই সাব্যস্ত করা; কোনো প্রকার তাবিল, তাতিল, তাহরিফ, তাকয়িফ তামসিল ছাড়াই। আমাদের বিশ্বাস, সালাফরা সিফাতগুলো (বাহ্য অর্থে) ইসবাত করতেন, তাফবিদ (অর্থ না জানার দাবি) করতেন না। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁরা আল্লাহর আসমা ও সিফাতগুলোকে মুতাশাবিহ'১৩৯ মনে করতেন না; বরং তাঁরা ওগুলোর অর্থ জানতেন, কিন্তু ধরন নিয়ে প্রশ্ন করতেন না। কারণ, ধরন অজানা। আমরা এ ব্যাপারে ওই কথাই বলব, যা ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

الاسْتِوَاهُ مَعْلُومٌ ، وَالْكَيْفَ مَجْهُولٌ ، وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ

'ইস্তিওয়া (আরশে সমুন্নত হওয়া) বোধগম্য, তবে ধরন অবোধগম্য। এর প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব, প্রশ্ন করা বিদয়াত ।'১৪০

আমরা ইস্তিওয়াকে প্রভাব বিস্তারকরণ বা ক্ষমতাগ্রহণ অর্থ করব না। নুযুল বা আল্লাহর অবতরণের বেলায়ও একই কথা। এমনিভাবে আমরা বলব, তাঁর হাত রয়েছে, তবে আমাদের হাতের মতো নয়। আবার তাঁর হাতকে আমরা কুদরত বা ক্ষমতাও বলব না। আমরা বলব,

مَذْهَبُ السَّلَفِ أَسْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَحْكَمُ

'সালাফদের মাযহাবই হলো সবচেয়ে নিরাপদ, জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাময়।'

এ কথা বলব না যে,

مَذْهَبُ السَّلَفِ أَسْلَمُ وَ مَذْهَبُ الْخَلَفِ أَحْكَمُ

'সালাফদের মাযহাব নিরাপদ, আর খালাফদের মাযহাব প্রজ্ঞাময়।'

১৩৮.দাফয়ু শুবহাতিত তাশবিহ, পৃষ্ঠা : ১৫৩ (দারুল ইমাম আননাওয়াবি, জর্ডান, হিজরি : ১৪১৩)

১৩৯. মুতাশাবিহ—যার অর্থ ও উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহই জানেন। যেমন, কুরআনের বিভিন্ন সুরার শুরুতে থাকা বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো। (অনুবাদক)

১৪০. শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১০৫

আমরা বলি, সালাফদের মাযহাবই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মাযহাব। (তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।) পরবর্তী কিছু আলিম, যারা তাবিলের পক্ষপাতী ছিলেন, যেমন, আশয়ারিগণ,'১৪১ তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। তবে সিফাতের তাবিলের ক্ষেত্রে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুগামী নন। আমরা এই বিশ্বাস রাখি যে, আশয়ারিরা কাফির নয়, তাবিলের কারণে তারা মুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজও নয়; বরং তারা এ ব্যাপারে ভুল করেছেন। বিশেষ করে ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলিম উম্মাহর অসংখ্য আলিম-উলামা তাবিল করেছেন। তাদের বড় অংশ জুড়েই ছিলেন ফিকহ, তাফসির ও ইলমুল হাদিসের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও মহান কীর্তিমান সন্তানগণ। তাবিলের প্রতি তাদের ঝুঁকে যাবার কারণ ছিল, সাদৃশ্যবাদ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে পবিত্র রাখা। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। পদস্খলিত ও পথচ্যুতদের ক্ষমা করেন।

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে পথপ্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র ও করে দেবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই অধিক দাতা।'১৪২

তা ছাড়া অসংখ্য সত্যবাদী ব্যক্তি সালাফদের মাযহাবে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মাঝে অন্যতম হলেন আবুল হাসান আশয়ারি রহিমাহুল্লাহ। তিনি এর আগে মুতাযিলাদেরও নেতা ছিলেন। সেই ভ্রান্তি থেকে ফিরে এসে মুতাযিলাদের বিরুদ্ধে তিনশতেরও বেশি বই-পুস্তক রচনা করেন। তিনি তাঁর الابانة عن اصول الديانة এবং مقالات الاسلاميين গ্রন্থদ্বয়ে নিজ আকিদাহর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

'আমাদের আকিদাহর সারকথা হলো, আমরা আল্লাহকে স্বীকার করি, তাঁর মালায়িকাহ, কিতাবসমূহ ও রাসুলদের স্বীকার করি। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন

---

১৪১. ইমাম আবুল হাসান আলি বিন ইসমায়িল বিন আলি বিন আবি বাশার আলআশয়ারি (মৃ. ৩৩০ হি.) রহিমাহুল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁর অনুসারীদের 'আশয়ারি' বলা হয়। ইমাম আশয়ারি মুতাযিলাদের বড় নেতা ছিলেন। একসময় মুতাযিলি মতবাদ ত্যাগ করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রচুর বই-পুস্তক রচনা করেন। এরপর তিনি সিফাতের মাসয়ালায় তাবিলের মানহাজ গ্রহণ করেন। পরিশেষে জীবন-সায়াহ্নে এসে তিনি সালাফদের সর্বসম্মত মানহাজ—ইসবাতুল মানা ওয়াল তাফবিদুল কাইফ—গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারেও তিনি বিভিন্ন কিতাব রচনা করেন। 'আলইবানাহ আন উসুলিদ দিয়ানাহ' তাঁর আকিদাহর বিবরণীমূলক প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। (অনুবাদক)

সেগুলোও স্বীকার করি এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ যা বর্ণনা করেছেন তাও স্বীকার করি। আমরা এর কোনো কিছুই প্রত্যাখ্যান করি না....। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার চেহারা রয়েছে, যেরকম তিনি বলেছেন,

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'ধ্বংস হবে না কেবল তোমার মহামহিম ও চিরসম্মানিত রবের চেহারা।'১৪৩ তাঁর দুই হাত রয়েছে, তবে কাইফিয়াত মুক্ত। যেমন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

'আমি আমার উভয় হাত দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছি।'১৪৪

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

'বরং তাঁর উভয় হাত বিস্তৃত হয়ে আছে।'১৪৫

এমনিভাবে তাঁর দুই চোখ রয়েছে, তবে কাইফিয়াত মুক্ত। তিনি বলেন,

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

'(নৌকাটি) আমার চোখের সামনে ভ্রমণ করবে।'১৪৬'১৪৭

১৪২.সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৮

১৪৩.সুরা রাহমান, ৫৫ : ২৭

১৪৪. সুরা সাদ, ৩৮ : ৭৫

১৪৫. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৬৪

১৪৬. সুরা কামার, ৫৪ : ১৪

১৪৭. আলইবানাহ, পৃষ্ঠা : ২১-২২

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহর বিধানের প্রতি সন্তুষ্টি

দাসত্বের প্রথম শর্ত : আল্লাহর শরিয়াতের কাছেই সব ফায়সালা উপস্থাপন করা

যেসব দুরবস্থার মাঝে দিয়ে বর্তমান মানবসভ্যতা অতিক্রম করছে, যেসব জটিল পথপরিক্রমা দিয়ে মনুষ্যস্বভাব-প্রকৃতি চলাচল করছে, মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে-স্থলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার সবই হয়েছে আল্লাহর কিতাবের কাছে নিজেদের বিচার-ফায়সালাকে না ফেরানোর কারণে। আজ মানবসভ্যতা যেসব বিপদ ও দুর্যোগের মোকাবেলা করছে, এর ওষুধ ও উপমশ কুরআনুল কারিমের কছেই রয়েছে। কুরআনের কাছে সব বিচার-ফায়সালা ও বিবাদ-বিতর্ক ন্যস্ত করা কোনো নফল কাজ নয়, বরং এটি ইমানের অন্যতম অংশ। এই বিষয়টি অনুপস্থিত থাকার মানে ইমানই অনুপস্থিত থাকা। কুরআনুল কারিমে এসেছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

‘না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সঙ্কীর্ণতামুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।।’[১৪৮]

---

১৪৮. সুরা নিসা, ৪ : ৬৫

এই আয়াতটি আমাদের এই মহান দ্বীনের বড় একটি মৌলনীতি ও মূল অবকাঠামো হিসেবে কাজ করে। আর এই মূলনীতিটি এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, এটি ছাড়া ইমান ও ইসলামই মূল্যহীন। যেদিন থেকে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেদিন থেকে এটিই মুসলিমদের মূল ও সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল এবং এটিই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রনীতি। এটি সব যুগেই হওয়া উচিত। এটিই বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ও অবশ্যপালনীয় কাজ, যার প্রতি সব মুসলিমের চিন্তা ও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। সব বিচার ফায়সালা, বিবাদ-বিতর্ককে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতু রাসুলিল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে ন্যস্ত করার নামই হচ্ছে ইসলাম।

কুরআনুল কারিমের এই আয়াতটি এমন কম্পন ধরানো বক্তব্য তুলে ধরছে, যার সামনে মানুষের শরীরের জোড়া-উপজোড়া শিউরে ওঠে এবং যা শুনলে পাহাড়- পর্বত প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এটি ধ্রুব সত্য, ধারণা ও কল্পনার চেয়ে বহুগুণে স্পষ্ট, যা মানুষের হৃদয় থেকে কখনো অদৃশ্য হয় না এবং মানুষের মস্তিষ্ক থেকে বিস্মৃত হয় না। এটি এ জন্যই যে, আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই সাম্রাজ্যে বসবাস করি। আমরা তাঁর অসংখ্য সৃষ্টি থেকে একপ্রকার সৃষ্টিমাত্র, তাই তাঁর বিধান আমাদের মাঝে সুসজ্জিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাঁর বিধান আমাদের মাঝে সুসমন্বিতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নয়তো যেকোনো বিধানই পৃথিবী ও মানবজাতির স্রষ্টার বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ করে বসতে পারে। আর এমনটি ঘটলে তা হবে মহান স্রষ্টা ও অধিপতি আল্লাহর বিনা অনুমতিতে বৈরী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ; বরং মালিকের রাজ্য ও সাম্রাজ্য, নিয়ম-নীতি এবং দাসদের নিয়ে মালিকের সাথেই বিবাদ ও বৈরিতায় অবতীর্ণ হওয়া। এটি হবে মহাবিশ্বের মহিমান্বিত সম্রাটের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ—যিনি আপন রাজত্বে যেভাবে চান সেভাবেই কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ করেন—তাঁরই সাথে অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া, পরিশেষে তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করে বসা।

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

‘তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায় না, বরং (তারা যা করে সে ব্যাপারে) তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।’১৪৯

১৪৯. সুরা আম্বিয়া, ২১ : ২৩

আল্লাহর দ্বীন তাঁর সব আদেশ-নির্দেশের সমষ্টি, যা বিশ্বাসের সবদিকে মুড়িয়ে থাকে, যেভাবে ইবাদত-বন্দেগিসহ সব বিধিবদ্ধ কাজকর্ম ইসলামের 'শিয়ার' বা অনন্য প্রতীকগুলো বাস্তবায়নের মাঝে প্রস্ফুটিত হয় এবং পরিশেষে শরিয়াতের আইন-কানুন ও সার্বিক বিধানাবলির মাঝে প্রতিফলিত হয়। শরিয়াতের প্রতিটি অংশ ও দিক-প্রান্ত যেভাবে পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তেমনিভাবে এগুলোর কোনো অংশ যদি তা থেকে চ্যুত হয় বা ব্যাহত হয় তাহলে এই দ্বীন তার অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে অনেক পিছিয়ে যাবে। কারণ, ইসলাম ওইসব সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশের মতো গভীরভাবে সংযুক্ত, যার কোনো একটি অংশ যদি খুলে নেয়া হয় বা তার গঠনবহির্ভূত নতুন কোনো যন্ত্রাংশ সংযুক্ত করা হয়, তাহলে সেই যন্ত্রটি একেবারেই বিকল ও অকেজো হয়ে পড়ে।

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্যই অনন্য অতুলনীয় ও সর্বোন্নত উপমা। মহান রবের দ্বীন—যার সর্বশেষ অধ্যায়ও শরিয়াতের মাধ্যমে পূর্ণতায় পৌঁছেছে, যা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে—কখনোই মনুষ্য-চিন্তাপ্রসূত ও ধ্যানধারণা-উদ্‌গত জীবনধারার সাথে একত্রে বাস করতে পারে না এবং নিজ রং ছাড়া অন্য কিছুই সে গ্রহণ করে না। সুতরাং মানবসভ্যতা যদি তার পরিপূর্ণ অবকাঠামোতে এই দ্বীন গ্রহণ করে, সন্তুষ্টচিত্তে সব বিচার-ফায়সালায় এর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে তাহলেই তারা দ্বীনের মূল কাঠামোখণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে এবং এই মহান ধর্মগণ্ডির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু তারা যদি এর সামান্য থেকে সামান্যতম অংশেরও আনুগত্য ত্যাগ করে এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তাহলে তাদের ঔদ্ধত্যের যেকোনো কারণই থাকুক না কেন, তারা দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং অন্যায় ও অযৌক্তিক পন্থায় পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টিকারী হিসেবে কলঙ্কিত হবে। কেননা, তারা আল্লাহর রুবুবিয়াত বা কর্তৃত্বের মাঝে শরিকানা স্থাপনের চেষ্টা করেছে এবং তাঁর রাজত্ব ও দাসদের মাঝে নিজের প্রভাব ও কর্তৃত্ব তৈরি করতে চেয়েছে, তাই এ হিসেবে সে আল্লাহর সাথে শিরক করেছে।

চলুন, আয়াতটিকে মূলনীতি ধরে কিছু আলোচনা করি। এই আয়াতের বাহ্য অর্থ এ কথাই প্রমাণ করে যে, যে বা যারাই আল্লাহর শরিয়াতের কাছে সব বিচার- ফায়সালা ও বিবাদ-বিতর্ককে সন্তুষ্ট চিত্তে ও আত্মসমর্পিত হয়ে ন্যস্ত করবে না, সে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ ক্ষেত্রে এরচেয়ে শক্তিশালী বা সমপর্যায়ের কোনো দলিল উপস্থাপিত হয়নি; বরং প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে এরচেয়ে কম শক্তিশালী ও সরল দলিলও উল্লেখ হয়নি, যা এই আয়াতের বাহ্য অর্থকে বাহ্যতা থেকে বের করতে পারে।

ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন,

'তাবিলের কোনো অবকাশ রাখে না এমন একটি বিধানসংবলিত আয়াত বা এমন কোনো নসও অবতীর্ণ হয়নি যা অর্থের বাহ্য বা প্রকাশ্য থেকে অর্থকে বের করে দেবে, এমনকি ইমানের কিছু অধ্যায়ের সাথে অর্থকে খাস করার কোনো দলিল-প্রমাণও নেই।'[১৫০]

তবে ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ কতিপয় আলিম থেকে لا يُؤْمِنُونَ (তারা ইমানদার হিসেবে গণ্য হবে না)-এর ব্যাখ্যা করেছেন, لا يستكملون الإيمان (তারা ইমানকে পূর্ণ উৎকর্ষতায় পৌঁছাতে পারবে না)।'[১৫১] কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি একাধিক কারণে অগ্রহণযোগ্য।

১. ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে :

এটি আভিধানিকভাবেও প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা মাসদার ছাড়া কোনো নাত বা সিফাতই সাব্যস্ত হবে না। যেমনটি কাযি আবু যায়িদ আদদাবুসি রহিমাহুল্লাহ 'তাকয়িম' গ্রন্থে বলেছেন। সুতরাং যদি আয়াতটি এইভাবে থাকত যে, فلا و ربك لا يومنون (ايمانا) حتي يحكموك তবেই নাত বা সিফাত সাবিত করা বৈধ হতো এবং তার পাশে كاملا শব্দটি উহ্য ধরা ঠিক হতো; অথচ এখানে মাসদারই নেই। তাই দাবুসির ভাষ্য অনুযায়ী এখানে সিফাত সাবিত করা বৈধ নয়। এ তো গেল একদিক। অন্যদিকে কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই বাহ্য অর্থকে পরিহার করা হচ্ছে। এখানে কোনো গোপন শব্দ উহ্য রাখারও প্রয়োজন নেই। কোনো তারজিহদানকারী নিদর্শন ছাড়া যাহিরি অর্থকে পরিহার করে তাবিলের দিকে ঠেলে দেয়া অবৈধ।

২. ফিকহশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে :

হানাফিদের কাছে কোনো উহ্য মাফউল তখনই গ্রহণীয় হয় যখন কোনো বক্তব্যকে ঠিক রাখার জরুরি চাহিদা দেখা দেয়। আর কোনো শব্দ বা বাক্যকে ব্যাপক ও সার্বজনীন করে দেয়াটা

---

১৫০. আলমিলাল ওয়াননিহাল, ৪/৭১

১৫১. ফাতহুল বারি, ৫/৩৬

প্রয়োজনেরও অধিক একটি বিষয়। তাই এখানেও উহ্য মাফউল ধরা যাবে না। যেহেতু শব্দ বা বাক্যের ব্যাপকতার অবকাশ শেষ হয়ে গেছে, তাই সেই শব্দকে খাস করার প্রশ্নও বাতিল হয়ে গেছে। কারণ, যে শব্দের মাঝে উমুম বা ব্যাপকতার সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গেছে সেই শব্দের মাঝে তাখসিস বা নির্দিষ্টকরণের অবকাশও শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং কেউ যদি বলে, 'আমি খাবার খেলে আমার স্ত্রী তালাক' আর সে এ দ্বারা সব খাবার নয়, বরং বিশেষ কোনো খাবারের উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে হানাফিদের কাছে তাকে সততার দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যবাদী মনে করা হলেও ফায়সালার দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যবাদী ধরা হবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, 'তুমি তালাক' আর সে এ দ্বারা তিন তালাকের নিয়াত করে, তাহলে হানাফিদের কাছে তার এই নিয়াত গ্রহণযোগ্য হবে না। শুধু এক তালাকে রিজয়ি হবে। কিন্তু শাফিয়িদের কাছে তিন তালাকই হয়ে যাবে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফিরা এই আয়াতের মাঝে উহ্য কোনো মাফউল রাখা বৈধ মনে করেন না। কামাল ইবনু হুমাম রহিমাহুল্লাহর 'ফাতহুল কাদির'-এ উল্লেখ আছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে বলে, আমি গোসল করব না; অথবা বলল, আমি নিকাহ করব না এবং সে এ দ্বারা উদ্দেশ্য নিল, সে কোনো একজন স্ত্রীর সাথে হওয়া জানাবাত থেকে গোসল করবে না, তাহলে তাকে একেবারেই সত্যায়ন করা হবে না।'

আমি মনে করি, ধারণানির্ভর কোনো মতামত কোনো নসকে নির্দিষ্ট করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী কারণ নয়। এ জন্যই শাফিয়ি মাযহাবের ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'আয়াতের বাহ্য অর্থ এটিই প্রমাণ করে যে, কিয়াসের মাধ্যমে নসকে তাখসিস করা বৈধ নয়, কারণ আয়াতের বাহ্য অর্থের দাবি হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সব কথা, বিচার ও শাসনব্যবস্থার আনুগত্য করা সার্বিকভাবে অপরিহার্য। আর আয়াতের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করাও বৈধ নয় এবং এই আয়াতের মাঝে যে পরিমাণে তাকিদ ও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে অন্য কোনো ইবাদত ও বিধিবিধানের মাঝে এত গুরুত্বারোপ করা হয়নি। এ কারণেই কুরআনের বক্তব্য ও তার ব্যাপকতাকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব।'১৫২

৩. উক্ত ব্যাখ্যাটি আয়াতের মূল উদ্দেশ্যের সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ, কেননা এখানে আয়াতের অর্থ 'ইমানুল কামিল' ধরলে নস ও মূল আয়াতই চাপা পড়ে যায় এবং তা নসকে একেবারেই অসঙ্গত করে তোলে। কারণ, এর আগে আরও অনেক আয়াত এই আয়াতের অর্থকে আরও মজবুত ও সুসংহত করে যে, আল্লাহর শরিয়াহর সামনে সব বিচার-ফায়সালাকে ন্যস্ত করা এবং তাঁর

রাসুলের নির্দেশের সামনে সব মীমাংসা সমর্পণ করাই ইমান ও ইসলাম। এ ছাড়া ইমান ও ইসলামের মর্মই বা আর কী থাকে! এমন একটি আয়াত দিয়ে এর পরবর্তী ধারা শুরু করব, যা ইসলাম পালনের শর্তকে নির্ধারণ করে দেবে এবং ইমান আনার সীমানাও নির্ধারণ করে দেবে। এই আয়াত দিয়ে শুরু করব,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের কর্তৃত্বের অধিকারীদের। এরপর তোমাদের মাঝে কোনো বিষয়ে বিভেদ হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যদি তোমরা (সত্যিই) আল্লাহর ও আখিরাতের প্রতি ইমান এনে থাক। এটিই উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে শ্রেয়তর।'১৫৩

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَدَلَ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَحَاكَمَ فِي مَحَلِ النَّوَاعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ مُؤْمِناً بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

'বোঝা গেল, যে ব্যক্তি বিবাদ-বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডার সময় কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করবে না এবং এই দুটো বিষয়ের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে না, সে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে না'১৫৪

আপনারা কি ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহর কথা খেয়াল করেছেন? তিনিও শরিয়াহর কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত না করাকে ইমান থেকে বের হয়ে যাওয়া গণ্য করেছেন, চাই সে যতই ইমান আনুক ও ইসলাম পালনের দাবি করুক না কেন। এ কারণেই এর পরের আয়াতটি বিষয়টিকে আরও মজবুত ও সন্দেহমুক্ত করে দিচ্ছে,

---

১৫২. তাফসির মাফাতিহুল গায়িব, ৫/২৬৯

১৫৩. সুরা নিসা, ৪ : ৫৯

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, অবশ্যই তারা তোমার প্রতি এবং তোমার আগে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ইমান এনেছে। কিন্তু তারা বিচার- ফায়সালা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাগুতকে অস্বীকার করতে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান চায় তাদের ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। আর যখন তাদের বলা হয়, 'তোমরা আসো, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং তাঁর রাসুলের দিকে।' তখন মুনাফিকদের দেখবে তারা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে ফিরে যাচ্ছে।'১৫৫

সুতরাং ইমানের কোনো বিষয়ে ধারণা, খেয়াল, কল্পনা কোনোই কাজে আসবে না। আর এ কারণেই তাগুতের—আল্লাহর শরিয়াহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা বা মতবাদ—বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করা কোনোভাবেই ইমান নয়, বরং মারাত্মক ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শরিয়াহর কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত না করাকে এবং এ থেকে বাধাপ্রদান বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করাকে নিফাকের আলামত সাব্যস্ত করেছেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বর্ণনা করছেন যে, শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য নয়, বরং অনুসরণ ও আনুগত্যের জন্যই তিনি রাসুলদের পাঠিয়েছেন।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

'আমি যত রাসুল পাঠিয়েছি, সবাইকে কেবল আল্লাহর অনুমতিক্রমে অনুসরণের জন্যেই পাঠিয়েছি।'১৫৬

পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন,

---

১৫৪. তাফসির ইবনু কাসির, ৫/১৯৩

১৫৫. সুরা নিসা, ৪ : ৬০

১৫৬. সুরা নিসা, ৪ : ৬৪

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সঙ্কীর্ণতা মুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।'১৫৭

আয়াতটি যথাযথ স্থানেই এসেছে, আয়াতের ভাষ্যে এত স্বচ্ছতা, ঔজ্জ্বল্য ও শক্তি আছে, যা মানুষের হৃদয় থেকে হৃদয়ে এই বিষয়টি গেঁথে দিতে পারে এবং সব ধরনের প্রশ্ন, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে।

মানবজীবনে আল্লাহর আইনের প্রয়োজনীয়তা

মানবসভ্যতা যেসব দুরবস্থার শিকার হয়, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি যেসব পথ ও প্রান্তের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়, জলে-স্থলে নিজেদের কৃতকর্মের ফলে যে ফাসাদ, সন্ত্রাস ও জীবনঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীর বুকে দিকে দিকে, জনপদে জনপদে যে দুঃখ দুর্দশা ও দুর্ভাগ্য মানুষের হৃদয় ও আত্মাকে ক্ষত-বিক্ষত করে, এ সবকিছুর কারণ একটিই—মানুষের সৌভাগ্যের জন্য এই যে মৌলিক নীতিমালা ও আইন-কানুন দেয়া হয়েছিল, তা থেকে বের হয়ে যাওয়া কিংবা ছিটকে পড়া; কিতাবুল্লাহর কাছে সব বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করার মৌলনীতি এবং সব বিষয় ও ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠিগুলো এর মূল ও মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে হস্তান্তর না করা।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'তাঁর কাছেই আসমান-যমিনের যাবতীয় বিষয়াবলির চাবিকাঠি।'১৫৮

সুতরাং মানবসভ্যতা যে দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট-ক্লেশের মোকাবেলা করছে, যেসব ব্যাধি ও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছে, এ সবকিছুর একমাত্র ওষুধ ও উপশম মহান আল্লাহর এই কিতাবের মাঝে রয়েছে। কিতাবুল্লাহর কাছে সমস্ত বিচার- ফায়সালা ন্যস্ত করা কোনো নফল বা বাড়তি

---

১৫৭. সুরা নিসা, ৪ : ৬৫

১৫৮. সুরা শুরা, ৪২ : ১২

আমল নয় অথবা ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়, বরং এর নামই হলো ইমান। আল্লাহর শরিয়াতের কাছে বিচার- ফায়সালা ন্যস্ত করা ছাড়া ইমান ও ইসলামের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এর অনুপস্থিতি মানে ইসলামেরই অনুপস্থিতি।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো নির্দেশ-ফায়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করল, সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।'১৫৯

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

'তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান এনেছি এবং আনুগত্য করেছি।' তারপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে তারা ইমানদার নয়।'১৬০

এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে বহু আয়াত রয়েছে।

---

১৫৯. সুরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬

১৬০. সুরা নূর, ২৪ : ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

শরিয়াহ-প্রত্যাখ্যান : বড় কুফর

বান্দার সব ইবাদত কেবল তাঁর স্রষ্টার জন্যেই

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সঙ্কীর্ণতা মুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।'[১৬১]

ইতিপূর্বে আমরা মানবজীবনে আল্লাহর শরিয়াহর কাছে সব বিচার-ফায়সালা সমর্পণ করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেছি। তার অপূর্ব সৌরভ থেকে কিছু সুবাস গ্রহণ করেছি। এবার আমরা এই আয়াতের নির্মলতায় পরিশ্রান্ত হবো। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহর বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছি যে, এই আয়াতটি তার উমুমি মানা তথা অর্থের ব্যাপকতার ওপর বহাল রয়েছে। আয়াতটি কোনো প্রকার তাবিল বা ব্যাখ্যার সম্ভাবনাও রাখে না এবং এমন কোনো বিপরীতমুখী আয়াত কিংবা হাদিসও নেই যা আয়াতটিকে তার বাহ্য অর্থ থেকে বের করে দেবে, অথবা এমন কোনো শক্তিশালী প্রমাণও নেই, যা ইমানের কিছু কিছু অধ্যায়ের সাথে আয়াতটিকে নির্দিষ্ট করতে পারে। এমনিভাবে কিছু কিছু আলিম আয়াতটিকে যে ব্যাখ্যা করেছেন, 'তারা ইমানকে পূর্ণতার উৎকর্ষে পৌঁছাতে পারবে না', এরও অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছি। সুতরাং এই আলোচনার সারমর্ম হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বক্তব্যের বিপরীতে অন্য কারও কথা ও আপত্তি চলবে না। উসুলের যত কিতাবাদি রয়েছে প্রত্যেকটির প্রথম পাতা

---

১৬১. সুরা নিসা, ৪ : ৬৫

মহান ইমাম ও উসুলবিদদের এই কথার ওপর ইজমার উদ্ধৃতির মাধ্যমে শুরু করা হয়-

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَاكِمُ وَحْدَه

'পুরো মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, সবকিছুর বিচারক ও চূড়ান্ত ফায়সালাদানকারী একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।"

এই কথাটিই কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন অকাট্য আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلهِ

'বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই।'১৬২

এই আয়াতটি এমন একটি শব্দে অবতীর্ণ হয়েছে যে, এটি মহা পরাক্রমশালী একক সত্তার হাতে সব আইন, ব্যবস্থা ও পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট করে ফেলেছে। সুরা ইউসুফে দুবার এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম শাফিয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ

'মুসলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তির সামনে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ স্পষ্ট ও প্রকাশিত হবে, তার জন্য সেই সুন্নাহ ছেড়ে অন্য কারও মতামত গ্রহণ করা বৈধ নয়।'১৬৩

মুসলিম উম্মাহর প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে কুরআন-সুন্নাহ অপসারণের প্রথম ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা ছিল কুরআনের আইনকে চেঙ্গিস খানের আইন দিয়ে পরিবর্তন করার অপচেষ্টা, যার নাম ছিল الياس বা الياسق অর্থাৎ প্রশাসনিক রাজতন্ত্রবাদ। সেই সময় তাফসির, ইতিহাস ও হাদিসশাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ বেঁচে ছিলেন। সে সময়ে তিনি লিখিত আকারে নিজের সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেন,

فَمَنْ تَرَكَ الشَّرْعَ الْمُحْكَمَ الْمُنَزَّلَ عَلَى مُحَمَّد بن عبدِ الله صلى الله عليه وسلم وَتَحَاكُمْ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ الشَّرَائِعِ الْمَنْسُوخَةِ كَفَرَ فَكَيْفَ بِمَنْ تَحَاكُم إِلَى الْيَاسَقِ وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ مَنْ فَعَل ذٰلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

---

১৬২. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪০, ৬৭

১৬৩. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন, ২/৩২৫

‘মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হওয়া দ্ব্যর্থহীন শরিয়াহকে যে পরিত্যাগ করবে, অন্যান্য পরিত্যাজ্য অপসৃত বিচারব্যবস্থার কাছে নিজের বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্ত করবে, নিশ্চিত সে অবিশ্বাসী কাফির হিসেবে গণ্য হবে। তাহলে ওই ব্যক্তি কেন কাফির হবে না, যে আলইয়াসাকের কাছে বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্ত করে এবং কুরআনের ব্যবস্থার ওপরে একে প্রাধান্য দেয়? মুসলিমদের ঐক্যমতে নিশ্চয়ই সে কাফির।’১৬৪

আদি ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সাক্ষাতে আসলেন, তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করছিলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

“তারা (ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান) তাদের যাজক ও পুরোহিতদের এবং মরিয়মপুত্র মাসিহকেও আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।’১৬৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদি ইবনু হাতিমের কাছে ইয়াহুদি- খ্রিষ্টানরা তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রিদের কীভাবে পুজো-অর্চনা করত তার বৃত্তান্ত শুনাচ্ছিলেন। কিন্তু আদি ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, তারা তো তাদের যাজক ও পুরোহিতদের ইবাদত-বন্দেগি করেনি।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অবশ্যই, তবে তাদের যাজক ও পুরোহিতরা তাদের জন্য হারাম বিষয়গুলো হালাল করে দিয়েছিল এবং হালাল বিষয়গুলো হারাম করে দিয়েছিল। আর এতে তারা তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করত। এটিই হলো তারা তাদের ধর্মগুরুদের ইবাদত।’১৬৬

সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, সন্তুষ্টচিত্তে বা আনুগত্যপূর্বক মানবরচিত মতবাদের কাছে বিচার ফায়সালা ন্যস্ত করা মানেই হলো নিজের গর্দান থেকে ইসলামের শেকল ছুড়ে ফেলা। সুতরাং যে ব্যক্তিই আল্লাহর কালাম ছেড়ে অন্যের কথা ও নির্দেশকে বিচারের মানদণ্ড মেনে সন্তুষ্ট থাকবে বা কুরআন ও সুন্নাহর ওপর মানুষের মতবাদকে অগ্রগণ্য মনে করবে তবে ইসলামে তার কোনো অংশই নেই। এটি বড় কুফরি। আর এতে কোনো অস্বচ্ছতা, সন্দেহ-সংশয় ও অস্পষ্টতাও নেই। আল্লাহই হলেন বিধানদাতা এবং তাঁর কিতাব হলো তাঁর

---

১৬৪. আলবিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ, ১৩/১৩৯

১৬৫. সুরা তাওবাহ, ৯ : ৩১

১৬৬. সুনানুত তিরমিযি : ৩০৯৫

বিধানের তত্ত্বাবধায়ক। কুরআন-সুন্নাহর ওপর ছড়ি ঘোরানোর অধিকার মানুষের নেই। মানুষের দায়িত্ব তো কেবল তার অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করা।

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ

'সমগ্র মানবজাতি ছিল এক ও অভিন্ন জাতি, এরপর আল্লাহ সুসংবাদবাহক ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে নবিদের পাঠালেন এবং তাঁদের সাথে পাঠালেন সত্যসহকারে কিতাব, যেন মানুষেরা যে বিষয় নিয়ে মতবিরোধ করে তার মীমাংসা করতে পারে।'১৬৭

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাও মানুষের মাঝে ঘটে যাওয়া দ্বন্দ্ব নিরসনে নিজ কিতাবের মাধ্যমে ফায়সালা করেন, এমনটিই উদ্ধৃত হয়েছে তাফসির জালালাইনে। আর এই আয়াতের সাবাবুন নুযুল তথা আয়াত অবতীর্ণ হবার প্রেক্ষাপট আমরা যে মতামত পোষণ করি তারই সমর্থন করে। আমরা বিশ্বাস করি, যে ব্যক্তি আল্লাহর শরিয়াত ও বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে ফায়সালা না করবে এবং আল্লাহর বিধিবিধানের সাহায্যে মীমাংসা না করবে সে ইমানদার হতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হবে না, সে মুসলিম নয়; যদিও সে প্রথাগত কিছু ইবাদত-বন্দেগি করে। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ নিজ সনদে উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক আনসারি ব্যক্তির সাথে হাররা প্রান্তরের কোনো কূপ বা জলাধার নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালাপূর্বক বললেন, 'হে যুবাইর, তুমি তোমার জমি সিক্ত করে প্রতিবেশীর জন্য পানির ঢল ছেড়ে দাও।"

তখন সেই আনসারি বলে উঠল, 'সে আপনার ফুফাতো ভাই বলে (এই ফায়সালা করলেন)?' এ কথা শুনে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, "হে যুবাইর, তুমি তোমার জমিকে সিক্ত করাও, এরপর পানি সঞ্চয় করে রেখে দাও যতক্ষণ না দেয়াল পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। তারপর পাশের জনের জন্য নালা খুলে দিয়ো।'১৬৮ যেহেতু আনসারি ব্যক্তিটি যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিরক্ত করছিল, তাঁর মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল, তাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের পূর্ণ

---

১৬৭. সুরা বাকারাহ্‌, ২ : ২১৩

১৬৮. সহিহুল বুখারি : ৪৫৮৫

হক বুঝে নেয়ার নির্দেশ দিলেন; অথচ ইতিপূর্বে উভয়কে এমন একটি বিষয়ে আদেশ করেছিলেন, যেখানে দুজনেরই সহজতা ও কল্যাণ ছিল। যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমার মনে হয় এই আয়াতগুলো ওই ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

'না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে'১৬৯

যেহেতু ব্যক্তিটি আনসারি ছিল, তার মানে অবশ্যই সে বাহ্য ইবাদত-বন্দেগি পালন করত। এত কিছুর পরও এ আয়াত তার ইমানকে বাতিল ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে সব বিচার ফায়সালার ভার অর্পণ

এবার আমি এই গুরত্বপূর্ণ মূলনীতির—আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে সব বিচার-ফায়সালার ভার অর্পণ করা—সমর্থনে মুফাসসিরিনের বেশকিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। কাযি আবু ইয়ালা আলহাম্বলি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্ত করা কুফরির নামান্তর। আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট না থাকা কুফরি। এটি বিভিন্নভাবে প্রমাণিত।

প্রথম দলিল :

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

'তারা তাগুতের কাছে নিজেদের বিচার ফায়সালা ন্যস্ত করতে চায়, অথচ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করতে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'১৭০

এখানে, তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্তকরণকে তাগুতের প্রতি ইমান আনা ধরা হয়েছে।আর নিঃসন্দেহে তাগুতের প্রতি ইমান আনার মানেই হলো আল্লাহর প্রতি ইমান হারিয়ে ফেলা, আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করা। যেরকম আল্লাহর প্রতি ইমান আনার মানেই হলো তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা।

---

১৬৯. সুরা নিসা, ৪ : ৬৫

১৭০. সুরা নিসা, ৪ : ৬০

দ্বিতীয় দলিল :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

‘না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সঙ্কীর্ণতা মুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।’১৭১

সুতরাং এটি ওই ব্যক্তির কুফরির ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল, যে ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচার-সালিশ এবং বিধান-নির্দেশের প্রতি সন্তুষ্ট ও একনিষ্ঠ হয় না।

তৃতীয় দলিল :

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

‘যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনাহ (বিপর্যয়, দুর্যোগ) নেমে আসবে অথবা তারা কঠিন কোনো শাস্তিতে পাকড়াও হবে।’১৭২

এই আয়াতটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করা মারাত্মক অপরাধ। এই আয়াত প্রমাণ বহন করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশনামা থেকে সামান্য কিছুও প্রত্যাখ্যান করবে এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো আদেশের কোনো অংশও ত্যাগ করবে, নিশ্চিত সে মুসলিম উম্মাহ থেকে ছিটকে পড়বে, ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে তা সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ত্যাগ করুক বা অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়ে পরিত্যাগ করুক। এ জন্যই সাহাবা কিরাম যাকাত অস্বীকারকারীদের মুরতাদ সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তাদেরকে হত্যা ও তাদের সন্তানদের দাস বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই আয়াতই সেই সিদ্ধান্তের সত্যতা ও সঠিকতা নিশ্চিত করে।’১৭৩

---

১৭১. সুরা নিসা, ৪ : ৬৫

১৭২. সুরা নূর, ২৪ : ৬৩

১৭৩. তাফসির ইবনু আদিল, ৬/৪৫৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, হিজরি : ১৪১৯)

কাসিমি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কিছু কিছু মুফাসসির এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি তুষ্ট থাকা এবং তিনি যা বিধিবদ্ধ করেছেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব। এই আয়াত এও বলে যে, ইসলামের শাসনব্যবস্থা ত্যাগ করে অন্য কোনো ব্যবস্থার কাছে নিজেদের বিচার-ফায়সালা ও শাসনভার ন্যস্ত করা বৈধ নয়।'[১৭৪]

ইমাম হাকিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর শাসনবিধানে সন্তুষ্ট নয় সে কাফির। আর উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুনাফিকের সাথে যে আচরণ করেছেন, পরিশেষে হত্যা করেছেন, এ ঘটনাই বলে দেয় যে, এমন ব্যক্তির রক্ত বৈধ ও মূল্যহীন; অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হলে কোনো কিসাস বা দিয়াত আসবে না।'[১৭৫]

আলোচনায় এখানে আরেকটি মাসয়ালা আসে। দুজন ব্যক্তি কোনো বিবাদ নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হলো। তো তাদের একজন মুসলিমদের বিচারব্যস্থার শরণাপন্ন হলো। আরেকজন এতে অস্বীকৃতি জানাল এবং সে মুলহিদ বিচারকদের কাছে ফায়সালা নিয়ে গেল। তবে তো সে অবশ্যই কুফরি করল। কারণ, এটিই কাফিরদের বিচারব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে আমি বলব, যে ব্যক্তি মানবরচিত মতবাদ ও জীবনব্যবস্থায়—আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া সেসব আইন-কানুন ও শাসননীতি তারা বানিয়েছে, বরং সেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর উৎসমূলের সাথেই সাংঘর্ষিক—তুষ্ট থাকবে, জোরপূর্বক বাধ্য না হয়ে এই অসার ব্যবস্থার কাছে বিচার ফায়সালা ন্যস্ত করবে অথবা সন্তুষ্টচিত্তে ওইগুলো প্রচলন দেয়ার চেষ্টা করবে বা ওই অসার ব্যবস্থা স্বীকার করে নেবে কিংবা তা বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে, সে এই আয়াতে বর্ণিত হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবে, এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের গণ্ডি থেকে সে বের হয়ে যাবে।

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, এ আয়াত এক আনসারি ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ তিনি তো দৃঢ়ভাবে ইসলামের ইবাদত-বন্দেগি পালন করতেন, প্রকাশ্যে ইসলামের দাবিও করতেন; এতকিছুর পরও তার ইমানহীনতার ঘোষণা এসেছে।'[১৭৬] সর্বোপরি এ ব্যাপারে আল্লাহর শপথ কত কঠোর ও মজবুত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ

---

১৭৪. তাফসিরুল কাসিমি, ৫/১৩৫৫

১৭৫. তাফসিরুল কাসিমি, ৫/১৩৫৫

ও তাঁর রাসুলের কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করবে না এবং নিজেদের আইনপ্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণের আবেদন শরিয়াতের কাছে অর্পণ করবে না, সে কোনো মুমিনই নয়।

উস্তায সাইয়িদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন,

'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজ মহিমান্বিত সত্তার শপথ করে বলেন, কোনো ব্যক্তিই মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব বিষয়ে, সব প্রেক্ষাপটে বিচারক ও ফায়সালাদানকারী মানবে, তাঁর ফায়সালাতে সন্তুষ্ট থাকবে, নিজের অন্তরে কোনো সংকীর্ণতা না রেখে তাঁর ফায়সালা সার্বিকভাবে মেনে নেবে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সঙ্কীর্ণতা মুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।'[১৭৭]

স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিষয়টিকে সুদৃঢ়ভাবে বিবৃত করছেন এবং আপন সত্তার ওপর শপথ করে করে ঘোষণা দিচ্ছেন। এরপরও ইমানের শর্ত নির্ধারণ এবং ইসলামের পরিচয়প্রদানে কোনো ব্যক্তির কথা ও ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই এবং কোনো অপব্যাখ্যাকারীর অপব্যাখ্যারও সুযোগ নেই । হে আল্লাহ, অপ্রাজ্ঞ অগ্রহণীয় সব বিবাদ-কলহ থেকে পানাহ চাই। কেউ যেন না বলে, এই হুকুম ও বিধান কোনো যুগ বা কালের সাথে খাস ছিল এবং এই দায়িত্বটি কেবল বিশেষ দল ও পদাধিকারীদের ওপর ন্যস্ত ছিল। এমন উদ্ভট দাবি তো কেবল ওই লোকেরাই করতে পারে, যারা ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না, কুরআনের দীক্ষা স্বল্প-বিস্তর কিছুই বোঝে না; বরং এটিই ইসলামের সামগ্রিক বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয়, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মজবুত শপথ উচ্চারণের মাঝেই ফুটে উঠেছে, যা সব শর্ত থেকে মুক্ত ছিল। আর এখানে কোনো ধরনের খেয়াল বা ধারণারও অবকাশ নেই।

---

১৭৬. কেউ কেউ বলে থাকেন, 'তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আনসারিকে হত্যা করেননি কেন?? এর জবাব হচ্ছে, যদি সে মুনাফিক হয়ে থাকে তাহলে তার বাহ্য আমলের কারণে হত্যা করা হয়নি, আর যদি অজ্ঞ হয়ে থাকে তাহলে অজ্ঞতা ছিল তার ওজর। (লেখক)

১৭৭. সুরা নিসা, ৪ : ৬৫

কারণ,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফায়সালাদানকারী মনোনীত করা এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে বিচারব্যবস্থার স্বত্বাধিকারী মেনে নেয়ার অর্থই হলো তাঁর আনীত শরিয়াহ ও অনুমোদিত জীবনব্যবস্থাকে সব ফায়সালা ও সিদ্ধান্তদানের জন্য মনোনীত করা। তা না হলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রবর্তিত জীবনব্যবস্থার কোনো স্থান, অবস্থান ও স্থায়িত্বই থাকবে না। প্রথম খলিফাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে এই বক্তব্যই মুরতাদদের অবিশ্বাস ও বিচ্যুতি আরও তীব্র করে তুলেছিল। যার কারণে তিনি তাঁদের সাথে লড়াই করেছেন, বরং এরচেয়ে আরও অনেক ছোটোখাটো বিষয়ে লড়াই করেছেন। যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য না করার কারণে এবং ওফাতের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচার ফায়সালাকে গ্রহণ না করার কারণে যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তির ইসলাম প্রমাণ করতে হলে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের প্রমাণ পেশ করার জন্যে আল্লাহর শরিয়াহ ও নবির নির্দেশের কাছে সব বিচার-ফায়সালা ন্যস্তকরণ যথেষ্ট হলেও কারও ইমান প্রমাণ করার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট হবে না, বরং এর জন্য আত্মার তুষ্টি থাকতে হবে এবং হৃদয়ের আগ্রহ ও অনুরাগ প্রকাশ পেতে হবে। কারণ, হৃদয় থেকে উৎসারিত হওয়া ইসলাম এবং অন্তরাত্মা থেকে অঙ্কুরিত হওয়া আত্মসমর্পণের মাঝে তৃপ্তি, সুখানুভূতি ও আনন্দ-অনুরাগ সুপ্ত থাকে। এটিই ইসলাম, আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মনিবেদন এবং এটিই আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। সুতরাং নিজের অন্তরাত্মার দিকে একটু তাকিয়ে দেখো, তোমার দিল- দেমাগ ইসলাম থেকে কত দূরে, তোমার হৃদয় ও আত্মা ইমান থেকে কত দূর- মেরুতে!'[১৭৮]

আমরা মুফাসসিরদের বেশকিছু মতামত উল্লেখ করেছি, যার অনুকরণে মানবসভ্যতার সব জঞ্জাল দূর করার একমাত্র সমাধানটি বের হয়ে আসবে। এরপর মানুষের আর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না যে, আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক, তার মাঝে তাখসিস বা বিশেষ অর্থ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ আয়াতে ইমান তার ব্যাপকতার অর্থ হারিয়ে 'কামিল ইমান' অর্থে ব্যবহৃত হবে, এসব কথা বলার আর কোনো সুযোগই নেই। যদি কোনো ব্যক্তি দাবি করে, আয়াতটির মাঝে তাখসিস করা যাবে বা বিশেষ অর্থ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে, তাহলে অবশ্যই সে যেন সনদসহ এমন কোনো দলিল পেশ করে যা আয়াতকে তার বাহ্য অর্থ থেকে বের করে আনবে, অর্থাৎ আয়াতের অর্থের ব্যাপকতা ছেড়ে বিশেষ অর্থগ্রহণের দিকে যেতে বাধ্য করবে। কারণ, আয়াতের যাহিরি অর্থকে তাবিল করতে হলে তারচেয়ে মজবুত কোনো দলিল থাকতে

---

১৭৮. ফি যিলালিল কুরআন, ২/১৭০-১৭১

১৭৯.তাফসির মাফাতিহুল গায়িব, ১০/১৩২-১৩৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, হি : ১৪২১)

হবে। কোনো ধরনের কিয়াস বা সামান্য মিল দেখিয়ে আয়াতকে তার মূল ও বাহ্য অর্থ থেকে বের করা যাবে না। আমরা এ ব্যাপারে আগেও আলোচনা করেছি। ইমাম রাযি রহিমাহুল্লাহর বক্তব্যও তুলে ধরেছি যে, 'আয়াতের বাহ্য অর্থ এটিই প্রমাণ করে, কিয়াসের মাধ্যমে নসকে তাখসিস করা বৈধ নয়, কারণ আয়াতের বাহ্য অর্থের দাবি হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সব কথা, বিচার ও শাসনব্যবস্থার আনুগত্য করা সার্বিকভাবে অপরিহার্য।'১৭৯ তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এই শপথ যে, লোকেরা ইমানের বৈশিষ্ট্যে শোভিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা ইমানের বেশকিছু শর্ত-শারায়িত পূর্ণ করবে। তারমাঝে প্রথম হলো, যতক্ষণ না তারা পরস্পরের মাঝে যে বাদ-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-কোন্দল দেখা দেয়, তার নিরসনের ভার আপনার ওপর ন্যস্ত করবে।'১৮০

সুতরাং আমরা এতেই তৃপ্তিবোধ করছি, আমরা আয়াতের বাহ্য অর্থের প্রতি অনুগত হয়েছি এবং তার শক্তিশালী অর্থের ব্যাপকতার প্রতি অনুরক্ত রয়েছি। কারণ, এখানে অর্থের ব্যাপকতা ছেড়ে কিয়াস দিয়ে তাখসিসকরণ বা বিশেষ অর্থ গ্রহণ সম্ভব নয়। উক্ত আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট এবং আয়াতের ধারাবর্ণনা আমাদের সমর্থনে রয়েছে, যা ওইসব আয়াতে কেবল হাকিমিয়াহর—বিচারক ও ফায়সালাদানকারী হিসেবে সব ভার আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ন্যস্ত করা—বুঝকে মানুষের দিল থেকে দিলে গেঁথে দেয়ার জন্য এসেছে। আমাদের সামনে সম্মানিত মুফাসসিরগণের আরও সুস্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে। আমরা আমাদের চারপাশে চোখ বোলালেই একসময় ইসলাম দ্বারা শাসিত হওয়া শহর-জনপদগুলোতে আশ্চর্যজনক কিছু অধ্যায় দেখতে পাবো। সেই অঞ্চলগুলোর লোকেরা পরিসংখ্যানের দিক থেকে ভিন্ন দুই মেরুতে বসবাসকারী। একদলকে দেখতে পাবো, তারা তাগুতি বিচারব্যবস্থার কাছে নিজেদের সব বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্ত করছে এবং আল্লাহ-প্রদত্ত শাসনব্যবস্থাকে একেবারেই ত্যাগ করেছে। কিন্তু তারা এই ভয়াবহ প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ আঁচই করতে পারেনি যে, এই জঘন্য কাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর দ্বীন ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয় দলকে দেখতে পাবো, তারা তাগুতি মতবাদের কাছে সব বিচার-শাসন ও দিকনির্দেশনার দায়িত্ব তুলে দেয়, আবার সাথে সাথে এই মহান দ্বীনের বিরুদ্ধেও বিদ্বেষ ছড়ায়; যদিও জন্ম ও ভূসূত্র অনুযায়ী সে 'মুসলিম পরিচয়' গ্রহণ

১৮০.তাফসির মাফাতিহুল গায়িব, ১০/১৩১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, হিজরি : ১৪২১)

করে। নিজেদের অজ্ঞতা ও গাফলতির কারণে এবং ইসলামি শাসনব্যবস্থা না থাকা ও মুসলিমদের ইমাম অপসারিত হবার কারণে এই বিপদ মুসলিমদের ওপর চেপে বসেছে। এরপর ইয়াহুদিদের ঘোর চক্রান্তের মাঝ দিয়ে পতন ঘটে উসমানি খলিফাহ সুলতান আবদুল হামিদের। এক ভয়াবহ পরিকল্পনার মাঝ দিয়ে এই ষড়যন্ত্র শেষ হয়। সেখানে ইয়াহুদিদের অনেকগুলো গুপ্ত সংগঠন যুক্ত হয়েছিল। তারা বিভিন্ন রকমের পতাকা, প্রতীক, শিরোনাম-উপশিরোনাম ব্যবহার করে। যেমন ফ্রিম্যাসন, তুর্কি যুবপরিষদ এবং উন্নয়ন ও ঐক্যসংহতি পরিষদ ইত্যাদি। এরা নিজেদের জালে এই মহান দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখা অসংখ্য মানুষ শিকার করে।

এমনকি তাদের এই টোপে আধ্যাত্মিকধারার সুফিদের অনুসারী ও দ্বীনি ব্যক্তিবর্গের সংশ্রবে থাকা লোকও আটকে যায়। শুধু তাই নয়, সে সময় আযহারের এক শীর্ষ আলিম লেবাননভিত্তিক ফ্রিম্যাসনের'[১৮১] অনুষ্ঠান থেকে শঙ্খপ্রতীক ও ঝিনুকব্যাজ অর্জন করে। আরও বিস্ময়কর সংবাদ হলো, মিশরে সর্বপ্রথম এই ফ্রিম্যাসনের সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাও এমন ব্যক্তির হাতে যাকে কিনা বিরাট ইসলামি দায়ি মনে করা হয়! আর ফ্রিম্যাসনের দ্বিতীয় সভাও অনুষ্ঠিত হয় ওই ব্যক্তির এক ছাত্রের হাতে। সুতরাং বিষয়টি এখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল এবং এতে কোনো তর্ক-বিতর্ক নেই যে, ফ্রিম্যাসন গুপ্তসংঘ ও যায়নবাদ একই কাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা দুটো শাখা; বরং একই মায়ের দুই জোড়োয়া সন্তানের মতো। এই ইয়াহুদিবাদীদের হাতেই রয়েছে নীল নকশাকারীদের রহস্যময় সূত্র এবং বিভিন্ন কলকাঠি। এই নকশাগুলোর সাহায্যে তারা মানবসভ্যতার চিন্তাচেতনা ও অস্তিত্ব শেষ করে দিতে চায়, ধ্বংস করে দিতে চায় পৃথিবীর সব সভ্যতা-সংস্কৃতিকে। এ তো গেল একপ্রকারের নীল নকশা ও ষড়যন্ত্র।

অন্যদিকে, গোটা মুসলিম সমাজে তাদের হীন কলাকৌশল ও ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা চেপে বসল। তাদের শাসনব্যবস্থা—পৃথিবীতে আল্লাহ-প্রদত্ত শাসনব্যবস্থার স্থান দখল করে নিল। আর এই নতুন ধর্ম—মানবরচিত সেই নতুন ধর্মকে এমন একটি শাসনতন্ত্রে পরিণত করা হলো যে, আমাদের সন্তানেরাই এর পঠনপাঠন ও চর্চা-অনুশীলন শুরু করে দিলো। বিভিন্ন রকম ইউনিভার্সিটি ও ইন্সটিটিউট গড়ে উঠল। আর এসব ভার্সিটি ও ইন্সটিটিউট বিভিন্ন প্রকার কলেজ ও শিক্ষা অনুষদগুলোর নেতৃত্ব দিতে লাগল। সেগুলাতে এই নতুন ধর্মব্যবস্থার সব দিক, তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে চর্চা ও অনুশীলন হতে লাগল; হাজার- হাজার আগ্রহী মুসলিম সন্তানেরা এতে ভর্তির সুযোগ নিয়ে শিখতে আরম্ভ করল। নতুন এই ধর্ম তথা মানবরচিত আইন-কানুনের ওপর

---

১৮১. যায়নিস্টদের গুপ্ত সংগঠন (অনুবাদক)

ডিগ্রি নিল। পরবর্তীকালে তারাই পরিণত হলো এই নতুন ধর্মের রক্ষক, প্রহরী, পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাবেত্তায়। তারাই গ্রহণ করল এর দায়িত্ব ও নেতৃত্ব।

কী অদ্ভুত লক্ষ্য নিয়ে তারা ওইসব প্রতিষ্ঠান ও পাঠশালার ভার নিয়েছে, দেশ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব হাতিয়ে নিয়েছে। যেসব শহর-নগর ও জনপদ-লোকালয় এক সময় 'দারুল ইসলাম' ছিল বা তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, এখন তারা সেসব অঞ্চলের প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক কেন্দ্র, জনগোষ্ঠীর মূল নিয়ন্ত্রক ও চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। এভাবে একসময় তারা মানুষের স্থান ও অবস্থান পরিবর্তনের খেলাড়ি হয়ে উঠল এবং জনগণের রক্ত-মাংস ও ধন-সম্পদের রক্ষক-ভক্ষকের দায়িত্বে অবতীর্ণ হলো। অবশেষে হারিয়ে গেল আল্লাহর দ্বীনের রৌশনী। বাকি থাকল কেবল দৃশ্যমান কিছু ইবাদত-বন্দেগি, কিছু আচার-প্রথা। তাও দ্বীনের প্রতি গভীর অনুরাগী কিছু মানুষ এগুলো ধরে রেখেছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যারা আল্লাহ- প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার প্রতি নিজেদের সব আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করবে না, অথবা আল্লাহর বিধান ও ব্যবস্থা পাশ কাটিয়ে অন্য মতবাদ ও ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকবে কিংবা আল্লাহর নীতি-বিধানের সাথে মানুষের তৈরি ও প্রবৃত্তির অনুগামী মতবাদ, আচার-প্রথাকে সংযুক্ত করবে, এমনকি যেসব লোক বাতিল মতবাদ ও অসার নীতি দিয়ে আল্লাহর বিধান ও জীবনব্যবস্থা অপসারণকে সমর্থন দেবে, তারা এই মহান ও চিরন্তন দ্বীনের সীমা থেকে ছিটকে পড়বে। নিজের গর্দান থেকে ইসলামের শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলেছে বলে গণ্য হবে। উস্তায সাইয়িদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ বলেন,

'যারা প্রতিমাপূজারিদের ওপর শিরকের হুকুম লাগায় কিন্তু তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থীর ওপর শিরকের হুকুম লাগাতে পারে না, শিরকের হুকুম লাগাতে সংকোচ বোধ করে—কিন্তু ওখানে ঠিকই নির্দ্বিধায় শিরকের হুকুম লাগিয়ে দেয়—তারা মূলত কুরআনও পড়ে না, এই মহান দ্বীনের স্বভাব-প্রকৃতিও বোঝে না। তারা যেন গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করে, ঠিক ওইভাবে যেই স্বভাব- প্রকৃতির ওপর আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন।

তারা যেন আল্লাহর এই আয়াত অনুধাবন করে এবং আঁকড়ে ধরে,

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"যদি তোমরা তাদের (মুশরিকদের) আনুগত্য করো, তাহলে অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।'[১৮২][১৮৩]

চমৎকার হবে যদি আমরা উস্তায আহমাদ শাকির রহিমাহুল্লাহর বক্তব্যের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের ইতি টানি।

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে?'১৮৪

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উস্তায আহমাদ শাকির রহিমাহুল্লাহ বলেন,

'এই নতুন ধর্ম বা আইনব্যবস্থাকে লুফে নেয়া কি কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ হবে? ছেলে-মেয়েকে এই নতুন ধর্মটি শিখতে, এর চিন্তাবিশ্বাসকে গ্রহণ করতে এবং এর কার্যকর ও প্রায়োগিক দিক আয়ত্ত করতে পাঠানো কি কোনো বাবার জন্য বৈধ হবে, চাই সে জেনেশুনে পাঠাক বা না জেনেই? কোনো মুসলিমের জন্য কি অনুমতি আছে এই নব্য রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচারক পদে বসার?

না, এই অবস্থায় কোনো মুসলিমের জন্য আইন-অনুষদ বা বিচার-বিভাগের কোনো দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বাতিল। কোনোভাবেই তা শুদ্ধ বা অনুমোদিত হবার সুযোগ নেই। মানবরচিত এই নব্য মতবাদ ও বিচারকাঠামোর সবদিক ও বিষয়গুলো সুস্পষ্ট। এই ব্যবস্থাটি নিশ্চিত কুফরি, এর মাঝে কোনো অস্পষ্টতা নেই। এই ব্যবস্থার জন্য কাজ করা বা তার সামনে নত হওয়া কিংবা এর স্বীকৃতি দেবার ওজর-আপত্তি কোনো মুসলিমেরই চলবে না, চাই সে যে-ই হোক না কেন। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির সতর্ক ও সজাগ থাকা উচিত। কারণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সত্তার হিসাবগ্রহণকারী।'১৮৫

---

১৮২. সুরা আনয়াম, ৬ : ১২১

১৮৩. ফি যিলালিল কুরআন, ৩/১৫৪

১৮৪. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৫০

১৮৫. উমদাতুত তাফসির, ৪/৪৭

সপ্তম অধ্যায়

অপব্যাখ্যার কবলে বিধান-সংক্রান্ত আয়াত

বরাবরই কিছু মানুষের কথা ও ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায় যে, ওইসব কুরআনি নুসুসাতে—যেগুলো আল্লাহর আইন ছেড়ে মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার ফায়সালা করার কারণে তাদের কাফির বলে ঘোষণা দিচ্ছে—বর্ণিত কুফরির উদ্দেশ্য 'আমলগত কুফর', 'বিশ্বাসগত কুফর' নয় যা ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। তবে কেউ কেউ সত্য প্রকাশ করে বলেন, যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে সব বিচার-ফায়সালার দায়িত্ব ন্যস্ত করবে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে, পূর্ণাঙ্গ ইমানই নস্যাৎ হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ অদ্ভুত ও অবাক-করা কথা বলে, এই আয়াতে নাকি মুসলিমরা উদ্দিষ্টই নয়। তাই এদের কথাগুলো রদ করা এবং সঠিক বাস্তবতা তুলে ধরা প্রয়োজন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু কিছু প্রাথমিক কিন্তু মৌলিক বিষয়—যারা দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা করেন তারাও যে বিষয়গুলো উদাসীনতার সাথে এড়িয়ে চলেন অথবা এ ব্যাপারে অন্ধের মতো আচরণ করেন—নিয়ে আলোচনা করব।

এক. বড় বড় সাহাবিদের— যেমন, আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুম—কথা বা বক্তব্যকে যদি কুরআনের শব্দ-নান্দনিকতা, ভাষ্য-আলঙ্কারিকতা ও শব্দ

ব্যবহারের উচ্চাঙ্গতার মতো উন্নত ও সমৃদ্ধ মনে করা হয়, তাহলে তা সুস্পষ্ট কুফরি হবে যা ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেবে। এ ব্যাপারে গোটা আহলুল কিবলাহ একমত। তাহলে কেউ যদি বলে নেপোলিয়ন, ক্যাপিটান, জসুরিয়ান্ড ও জাস্টিনিয়ানের বক্তব্য কুরআনের শব্দ-বাক্য ও ব্যবহারের নান্দনিকতা, আলঙ্কারিতা, উৎকর্ষতা ও সৌন্দর্যের সমান অথবা তাদের রচিত মতবাদ ও প্রণীত আইন-কানুন আল্লাহ-প্রদত্ত দ্বীন-শরিয়াহর সমান, তাহলে কীভাবে সে কাফির না হয়ে থাকতে পারে? সুতরাং যে ব্যক্তি মানবরচিত প্রতিমাবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং

সেখান থেকে উদ্‌গত আইন-কানুনকে আল্লাহ- প্রদত্ত আইন-কানুনের ওপর প্রাধান্য দেয়, তবে কেন সে কাফির হবে না?

সাহাবি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

'আমার আশঙ্কা হয়, অচিরেই তোমাদের ওপর আসমান থেকে পাথরবৃষ্টি বর্ষিত হবে। কারণ, আমি বলি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আর বিপরীতে তোমরা বলো, আবু বকর ও উমার বলেছেন।'[১৮৬]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, "ওই লোকদের দেখে আমি বিস্মিত হই, যারা সনদ সম্পর্কে জানে, তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখে, তবুও তারা সুফিয়ানের রায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনাহ নেমে আসবে অথবা কঠিন কোনো শাস্তিতে পাকড়াও হবে।'[১৮৭]

তুমি কি বলতে পারবে ফিতনাহ কী জিনিস? শোনো, ফিতনাহ হলো শিরক। হতে পারে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের কিছু অংশ পরিত্যাগ করেছে, যার কারণে তার দিলদেমাগে বক্রতা ও কুটিলতা জন্মেছে। অবশেষে সে ধ্বংসগহ্বরে নিপতিত হয়েছে।'[১৮৮]

দুই.

জরুরিয়াতুম মিনাদ দ্বীন তথা দ্বীনের সর্বজনস্বীকৃত অপরিহার্য কোনো আমল বা আকিদাহর কোনো একটি অস্বীকার করার মাধ্যমে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। মুসলিম মিল্লাত থেকে ছিটকে পড়বে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে আসরের সালাত তিন রাকায়াত, তাহলেও সে কাফির হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে বলবে, ফরজ সিয়াম রমাদান কিংবা শাওয়ালে রাখা উভয়টিই সমান এবং

---

১৮৬. মুসনাদু আহমাদ: ৩১২১ (কিছুটা শাব্দিক ভিন্নতা সহকারে)

১৮৭. সুরা নুর, ২৪: ৬৩

১৮৮. আলইবানাহ, ১/২৬০

কেউ যদি এভাবে রাখে তাহলে তার সিয়াম পালন হয়ে যাবে, তার ফরয আদায় হয়ে যাবে, তাহলে এমন বক্তব্যধারীও মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ এবং কাফির। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, চোরের শাস্তি হাত কেটেও দেয়া যাবে অথবা শেলে বন্দি করে রেখেও দেয়া যাবে, এতে কোনো সমস্যা নেই, তবে সেও কাফির। তাহলে ওই ব্যক্তি কীভাবে কাফির নয়, যে চোরের হাত কাটাকে হিংস্র আর বর্বরনীতি বলে, যেমনটি বলেছিল মিশরীয় আইনসভার প্রধান কর্মকর্তা?

তিন.

শরিয়াতের কোনো ছোটো বা আংশিক বিষয়েও হালালকে হারাম করা বা হারামকে হালাল করা সুস্পষ্ট কুফর, যা ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

‘যদি কেউ গাইরে মাহরামের দিকে দৃষ্টি দেয়াকে হালাল মনে করে, তাহলে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। আর কেউ যদি রুটি খাওয়াকে হারাম মনে করে, তাহলে সেও সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।’[১৮৯]

বারকানি রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি সহিহ হাদিস বর্ণনা করেন যে, জারুদ বাহরাইন থেকে এসে বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমি কুদামাহ ইবনু মাযউনকে দেখলাম সে নেশাদ্রব্য পান করছে। আমি চিন্তা করলাম এতে তো আল্লাহর একটি হক নষ্ট হলো, তখন আমি বিষয়টি আপনার কাছে পেশ করা আমার অপরিহার্য কর্তব্য মনে করছি।' তখন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমার এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ বা সাক্ষী আছে?' তিনি বললেন, 'হাঁ, আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহ সাক্ষী আছেন।' উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু হুরাইরাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর বললেন, 'হে আবু হুরাইরাহ, তুমি কি সাক্ষ্য দিতে পারবে?' তিনি বললেন, 'আমি তাকে নেশা করতে দেখিনি, তবে মাতাল অবস্থায় বমি করতে দেখেছি।' উমার রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, তাহলে তো তুমি স্পষ্টই সাক্ষ্য দিলে।

---

১৮৯. কাছাকাছি শব্দে কাওলটি এসেছে ‘মানারুল মুনিফ' গ্রন্থের ‘মুরতাদের বিধান’ অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা : ৪০৫)। তবে এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলামের প্রসিদ্ধ কাওলটি হলো,

وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - أَوْ حَرَّمَ الحَلَالَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - أَوْ بَدَّلَ الشَّوْعَ . الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ

কুদামাহ ইবনু মাযউন রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বাহরাইনে অবস্থান করছিলেন। চলে আসার নির্দেশ দিয়ে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে চিঠি পাঠালেন। যখন কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে পৌঁছলেন, তখন জারুদও মদিনায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ওপর আল্লাহর আইন প্রয়োগ করতে জারুদ উমার রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে আবেদন জানালেন। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জারুদকে বললেন, 'তুমি কি সাক্ষীদাতা নাকি বাদী?' সে বলল, 'আমি সাক্ষীদাতা মাত্র।' তিনি বললেন, 'তাহলে তোমার সাক্ষ্যদানের কাজ শেষ।' তখন জারুদ বলে উঠল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, একে শাস্তি দিন।' তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, 'আল্লাহর দোহাই লাগে তুমি তোমার জিহ্বার লাগাম টেনে ধরো, নয়তো তোমাকেই শায়েস্তা করা হবে।' জারুদ বলল, 'তাহলে তো এটা অন্যায় হবে। আপনার চাচাতো ভাই নেশা করবে আর আপনি আমাকে শায়েস্তা করবেন!' আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বসা থেকে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি যদি আমাদের সাক্ষ্যের ওপর তুষ্ট না হন, সংশয়ে থেকে থাকেন, তাহলে ওয়ালিদ-কন্যা ইবনু মাযউনের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

তখন তিনি হিন্দের কছে একটি চিঠি লেখেন, তাঁকে আল্লাহর শপথ দিয়ে সত্যতা জিজ্ঞেস করেন। হিন্দ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এখন আমি তোমাকে বেত্রাঘাত করতে পারি।' কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহ বলে উঠলেন, 'হে উমার আল্লাহর কসম, তাদের দাবি অনুযায়ী যদি আমি নেশা করেও থাকি তাহলে আপনি আমাকে বেত্রাঘাত করতে পারবেন। না।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' কুদামাহ বললেন, 'কারণ আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

'যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে,তারা আগে যা খেয়েছে সেজন্য তাদের কোনো গোনাহ নেই, যখন ভবিষ্যতের জন্যে সংযত হয়েছে, ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে।

'যখন কোনো ব্যক্তি সর্বসম্মত কোনো হারামকে হালাল করে বা সর্বসম্মত কোনো হালালকে হারাম করে, অথবা শরিয়তের সর্বসম্মত কোনো বিধান পরিবর্তন করে, তখন সে সমস্ত ফকিহের ঐক্যমতে কাফির হয়ে যায়।' [মাজমুয়ুল ফাতাওয়া, ৩/২৬৬] (অনুবাদক)

এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[১৯০]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'কুদামাহ, তুমি অপব্যাখ্যা করছ। তুমি যদি সত্যি সত্যি আল্লাহকে ভয় করতে তবে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাতে মত্ত হতে না।' তারপর তিনি লোকদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কুদামাহর বেত্রাঘাত ও শাস্তির ব্যাপারে আপনারা কী বলেন?' তখন লোকজন বলল, 'আমরা বলি, সে যতদিন অসুস্থ আছে ততদিন আপনি তাকে বেত মারতে পারেন না।' তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বেত মারা থেকে বিরত রইলেন। এরপর একদিন তিনি শুরা পরিষদকে বললেন, 'কুদামাহর বেত্রাঘাত সম্পর্কে আপনাদের কী অভিমত?' তাঁরাও মত দিলেন, 'তিনি যতদিন অসুস্থ আছেন তাঁকে বেত মারা থেকে বিরত থাকুন।'

তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি নিজ কাঁধে তাকে বহন করতে করতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার চেয়ে সে বেত খেতে খেতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা আমার কাছে বেশি প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমি তাকে এখনই বেত মারব। তোমরা চাবুক নিয়ে এসো।"

তখন তাঁর আযাদকৃত গোলাম আসলাম একটি ছোটো, জীর্ণ-শীর্ণ, থলথলে চাবুক নিয়ে এল। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু চাবুকটা হাতে নিয়ে স্পর্শ করে দেখলেন। আসলামকে বললেন, 'তোমাকে স্বজনপ্রীতি পেয়ে বসেছে।' তারপর এটি রেখে অন্য আরেকটি চাবুক নিয়ে আসার আদেশ করলেন। আসলাম অন্য আরেকটি চাবুক নিয়ে এল। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন। চাবুক মারা হলো। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ক্ষেপিয়ে তুললেন এবং ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। কথা কাটাকাটিতে কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিঃশ্চুপ করে দিলেন। কিন্তু, তবুও কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি করেই যাচ্ছিলেন। অবশেষে লোকজন তাঁদের কথা কাটাকাটি রেখে চলে গেল। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুও সুকইয়া নামক প্রান্তরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে

---

১৯০. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৯৩

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'কুদামাহকে তাড়াতাড়ি আমার কাছে নিয়ে এসো। যাও! তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে এসো। আল্লাহর শপথ, আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক আগন্তুক এসে আমাকে বলল—কুদামাহর সাথে সমঝোতা করে নাও, সে তো তোমার ভাই-ই।' লোকজন এসে কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যেতে বললে তিনি অনীহা প্রকাশ করলেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আদেশ দিলেন, তাঁকে যেন জোর করে নিয়ে আসা হয়। নিয়ে আসা হলে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন এবং তাঁর জন্য ইস্তিগফার করলেন।'১৯১

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শামের কিছু লোক মদপান করে বলতে থাকে—এই মদ আমাদের জন্য হালাল। তারা সে আয়াতটি তাবিল করে নিয়েছিল। কিন্তু আলি ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একমত হয়ে বলেন যে, তাদের তাওবাহ করতে বলা হবে, যদি তাওবাহ করে তাহলে তো ভালোই, নয়তো তাদের সবাইকে কতল করা হবে।'১৯২ এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো, কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কতল করা হয়নি, তিনি আয়াতের তাবিল করেছেন। তবে ভুল তাবিল করেছিলেন, যেমনটি উমার রাদিয়াল্লাহু বললেন যে, 'হে কুদামাহ, তুমি ভুল ব্যাখ্যা করছ।' তিরি সরাসরি বলেননি যে, মদ হালাল। এমনকি কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'আমি কুদামাহকে জিজ্ঞেস করব। যদি সে মদকে হালাল মনে করে, তাহলে ইরতিদাদের কারণে তাকে কতল করা হবে। আর যদি হালাল মনে না করে, তাহলে চাবুক মারা হবে।' আর এটি ওই বর্ণনারই অংশ যা শামের কিছু মদ্যপ লোকের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মদ ও নেশাজাত দ্রব্যকে হালাল মনে করবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। তাকে তাওবাহ করতে বলা হবে, যদি তাওবাহ করে, তো ভালো। নয়তো মুরতাদ হয়ে যাবার কারণে তাকে কতল করা হবে। এ বিষয়ে উমার ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুম অন্যান্য সাহাবির সামনে একমত হয়েছিলেন।কিন্তু কোনো সাহাবিই দ্বিমত পোষণ করেননি। কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাবিল

---

১৯১. আলজামিয়ু লি আহকামিল কুরআন, ৬/২৯৮

১৯২. আলজামিয়ু লি আহকামিল কুরআন, ৬/২৯৯

এর ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন। আবু বকর ইবনুল আরাবি রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য থেকেও এটি বোঝা যায়। কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাটি বর্ণনার পর তিনি বলেন,

هَذَا مِنْ أَفْسَدِ تَأْوِيلٍ ، وَقَدْ خَفِيَ عَلَى قُدَامَةَ ، وَعَرَفَهُ مَنْ وَفَقَهُ اللَّهُ لَهُ كَعُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ

'এটি ছিল অগ্রহণযোগ্য তাবিল এবং এই বিষয়ের হুকুম কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহ যাদের বোঝানোর যোগ্যতা দিয়েছিলেন—যেমন উমার, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম—তাঁরা তাঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন।'

সুতরাং, কোনো জিনিসকে হালাল করা, হারাম করা, বৈধ বা অবৈধ করা কেবল আল্লাহরই অধিকার। যে এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে, অবশ্যই সে আল্লাহর দাসত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে এবং নিজের গর্দান থেকে ইসলামের শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলবে।

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَـٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ

'বলো, আচ্ছা নিজেই লক্ষ করে দেখো, যা-কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মাঝ থেকে কোনটি হারাম আর কোনটি হালাল সাব্যস্ত করেছ? বলো, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করছ?'[১৯৩]

চার.

কুরআন, হাদিস অথবা প্রমাণিত কোনো সুন্নাহ নিয়ে যে ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল সে মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে গেল।

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَـٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ

---

১৯৩. সুরা ইউনুস, ১০ : ৫৯

‘আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। বলো, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম- আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? বাহানা করো না, তোমরা কাফির হয়ে গেছ ইমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মাঝে কোনো কোনো লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দিই-ও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেবো। কারণ, তারা ছিল অপরাধী।’[১৯৪]

সুতরাং যারা কুরআন বা সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে, কুরআনুল কারিম তাদের স্পষ্ট কাফির বলে ঘোষণা দিচ্ছে। এমনকি ওই ব্যক্তিকেও কাফির বলতে হবে, যে বলবে, “আল্লাহর দ্বীন সেকেলে, প্রাচীন প্রথা' অথবা মনে করবে, এ যুগে দ্বীন-শরিয়াহ অচল, এটি এক ছিন্নমূল প্রথাব্যবস্থা; কিংবা যদি বলে, এটি বনে- জঙ্গলে প্রয়োগযোগ্য একটি ব্যবস্থা। কারণ, এই ব্যক্তি এসব বক্তব্য ও অশোভন ভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রভুত্বের এমন স্থানে নিয়ে গেছে যে, সে এখন আল্লাহর এই মহান দ্বীনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, তার ভুল ধরতে থাকে এবং ত্রুটি বের করার ধান্ধায় থাকে। এ হিসেবে বাথিস্ট,’[১৯৫] কমিউনিস্ট ও ন্যাশনালিস্টদেরও কাফির বলতে হয়। কারণ, তারাও ইসলামকে একটি প্রাচীন, সেকেলে, নির্জীব, স্পন্দনহীন ব্যবস্থা বলে থাকে।

পাঁচ.

ইসলামকে সব যুগে, সব স্থানে প্রয়োগ-অযোগ্য ও ব্যবহার-অনুপযোগী মনে করাও স্পষ্ট কুফরি, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যারা বাথিজম ও কম্যুনিজমে বিশ্বাসী, তারা মনে করে ইসলাম কোনোভাবেই আধুনিক সমাজ, সভ্যতা, শহর-নগর, জনপদ-লোকালয় পরিচালনা করতে পারে না, ওগুলোর ওপর নেতৃত্ব করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা কোনোটাই রাখে না। তারা

---

১৯৪. সুরা তাওবাহ, ৯ : ৬৫-৬৬

১৯৫. বাথিজম—আরবি البعث অর্থাৎ ‘রেনেসা” বা ‘পুনরুত্থান’—একটি আরব জাতীয়তাবাদী মতবাদ। জাকি আলআরসুজি, মিশেল আফলাক ও সালাহউদ্দিন আলবিতারের থিওরির ওপর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। আরব জাতীয়তাবাদ, প্যান আরবিজম, আরবভিত্তিক সমাজতন্ত্রের ওপর

আরও মনে করে, ইসলাম কোনোভাবেই জাতির উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম নয়। তারা মনে করে ইসলামি অর্থব্যবস্থা সমাজ-সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থাকে কোনোভাবেই পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। এমনকি সমাজকে সমৃদ্ধ ও প্রাচুর্যময় করার দক্ষতাও নেই। শুধু তাই নয়, সমাজের চাওয়া-পাওয়া, চিত্তবিনোদন ও রুচিশৈলীর যোগানও দিতে পারবে না ।

তাই এরা আওয়াজ তোলে—আমরা দুনিয়ার অর্থনীতি ও সম্পদব্যবহার- রীতিতে মার্কসীয় চিন্তাদর্শন গ্রহণ করব এবং সাইন্টিফিক সোশ্যালিজম আঁকড়ে ধরব; আর এটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু নয়, ইমানের সাথেও দ্বান্দ্বিক কিছু নয়। অথচ তারা জানে না, এই ধরনের মূর্খতার মাধ্যমে তারা মহান রব্বুল আলামিনের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে যে, মার্কস আল্লাহর দেয়া অর্থব্যবস্থার চেয়ে ভালো ও সুন্দর অর্থব্যবস্থা তৈরি করেছে!

সুতরাং এটি সম্ভব নয় যে, কেউ এই ধরনের হঠকারী বক্তব্য দেবে, আবার মহান রব, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল ইযযতের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তা কিছুতেই সম্ভব নয়, বরং সে তৎক্ষণাৎই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মনোনীত দ্বীন থেকে নির্ঘাত ছিটকে পড়বে।

চলুন, এবার আমরা ওই ব্যাখ্যাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখি, যেগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলিমগণ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ওইসব আয়াতের ওপর চার ধরনের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছেন।

এক.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا (٦٥)

‘না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সঙ্কীর্ণতা মুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।’[১৯৬]

প্রতিষ্ঠিত বাথিজম। এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। বাথিস্ট রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সমর্থন করে। বাথিস্টরা বিশ্বাস করে, আরব সমাজকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সমাজতন্ত্রই একমাত্র পথ। (অনুবাদক)

১৯৬. সুরা নিসা, ৪ : ৬৫

এই আয়াতে বর্ণিত ইমানের উদ্দেশ্য হলো ইমানের পূর্ণাঙ্গতা; অর্থাৎ আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'তারা ইমানদার হতে পারবে না', এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, যে ব্যক্তি নবির শরিয়াতের কাছে সব বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্ত করবে না তার পুরো ইমানই চলে যাবে, বরং এ আয়াতে ইমানের পূর্ণাঙ্গতাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। তাহলে অর্থ হবে, তার ইমান পূর্ণ ইমান বলে গণ্য হবে না। এই বক্তব্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এবং কুরআনি আয়াতের ধারাবাহিক আলোচনা, আভিধানিক ও উসুলুল ফিকহের কাওয়ায়িদের আলোকে এর খণ্ডনও করেছি।

দুই.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।'[১৯৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, এটি এমন কুফরি নয় যা ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেবে; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো 'কুফর দুনা কুফর' অর্থাৎ ছোটো কুফর।

তিন. ওই ব্যক্তির ওপর কুফরের হুকুম দিতে হবে, যে ব্যক্তি কুরআন ও অকাট্য প্রমাণিত সুন্নাহর কোনো অংশ অস্বীকার করবে বা কোনো হারাম কাজকে হালাল মনে করে করবে। অন্যথায় তাকে কাফির বলা যাবে না।

চার.

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ... فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ...فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ

'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই কাফির, ...তারাই যালিম, ... তারাই ফাসিক।'[১৯৮]

তারা বলে, এই আয়াত নাকি আহলুল কিতাবদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি আমাদের মাঝে সত্য ঢেলে দেবেন; সত্য বলা, প্রকাশ করা, সত্যের অনুসরণ করার জন্য সাহায্য করবেন এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তাবিলগুলোর দুর্বলতাগুলো উন্মোচন করে দেবেন। আমিন।

---

১৯৭. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৪

১৯৮. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৪, ৪৫, ৪৭

কুফুর দুনা কুফর

যারা আয়াতে উল্লিখিত কুফরকে ছোটো কুফর মনে করেন, তাদের দলিলের উৎস হলো ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর কিছু ছাত্রের অভিমত। সেখান থেকে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি,

ক. তাউস রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা করেন, "তারা যা মনে করছে এটি সেই কুফর নয়। তা এমন কোনো কুফর নয়, যা ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেবে। উপর্যুক্ত আয়াতে ছোটো কুফর উদ্দেশ্য, বড় কুফর নয়।'

খ. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু বলেন, 'যদিও এটি কুফর, কিন্তু তা ওই ব্যক্তির কুফরির মতো নয়, যে আল্লাহ ও আখিরাতের ব্যাপারে কুফর করে।'

গ. আতা রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আয়াতে উল্লিখিত কুফর দ্বারা ছোটো কুফর উদ্দেশ্য, যুলুম দ্বারা বড় যুলুমের চেয়ে নিম্নস্তরের যুলুম উদ্দেশ্য, ফিসক দ্বারা বড় ফিসকের চেয়ে নিম্নস্তরের ফিসক উদ্দেশ্য।'

ঘ. তাউস রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আয়াতে উল্লিখিত কুফরিটা এমন কোনো কুফরি নয়, যা ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেবে।'

দলিল-খণ্ডন

আমরা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খণ্ডন করছি না। নবির সাহাবি ও প্রিয়পাত্রদের শানে কোনো অশোভন ও অমার্জিত আচরণ করা থেকে, তাঁদের সামনে নিজেদের স্পর্ধা দেখানো থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই; বরং এটি ওই ব্যক্তিদের খণ্ডন, যারা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষ্যের সাহায্যে দলিল পেশ করছে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

ক. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কল্পনায়ও ওই ব্যক্তির সুরত ও অবস্থা দৃশ্যমান ছিল না, যে ব্যক্তি (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) সত্য বলে ও সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু সাথে সাথে মহান রব্বুল আলামিনের বিধানকে সৃষ্টিজীবের বিধানের সমান মনে করে। আর বিষয়টি কত ভয়াবহ হতে পারে, যখন সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহর বিধানের ওপর কোনো হীন কাফিরের বিধানকে প্রাধান্য দেবে! আমার মনে হয় না কোনো সাহাবি বা তাবিয়ি তার কুফরি ও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করতেন। যখন এক মুনাফিক সালিশ নিয়ে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসল—যে ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগেই ফায়সালা দিয়েছিলেন—উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

তাকে কতল করে ফেললেন। আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ওই মুনাফিকের রক্তকে মূল্যহীন ঘোষণা করলেন। কারণ, এই যে কুকর্ম, অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচার-ফায়সালার ওপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিচারকে প্রাধান্য দেয়াটা ছিল সুস্পষ্ট কুফরি।

খ. সাহাবা কিরাম উক্ত মতামত ওই বিচারক ও আইনপ্রয়োগকারীর ব্যাপারে পেশ করেছিলেন, যে কিনা ঘুষ নিয়ে কোনো একটি বিচারে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করে না। এগুলো ওই ব্যক্তির ব্যাপারে ছিল না, যে ব্যক্তি আল্লাহ-প্রদত্ত গোটা আইন ও শাসনব্যবস্থাকেই অপসারণ করে এবং এর পরিবর্তে নিজ প্রবৃত্তির অনুগামী আইন-কানুন দিয়ে বিচারকাজ পরিচালনা করে। এর দলিল হচ্ছে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাওল। এটি আলকামাহ ও আসওয়াদ রহিমাহুমাল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ‘রিশওয়াহ’ বা ঘুষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি জবাব দিলেন, এটি ‘সুহত' তথা অবৈধ কাজের অন্তর্ভুক্ত। তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এটি যদি বিচারপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে হয়?' তখন তিনি বললেন, 'বিচারপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে হলে তো কুফর হবে। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

‘যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন দিয়ে বিচারকাজ পরিচালনা করে না, তারাই কাফির।’[১৯৯] ’[২০০]

কেউই উল্লিখিত বিচারকের এই কুফরি কাজকে এমন কুফরি বলেননি, যা বিচারককে মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয়; বরং এটি ‘কুফর দুনা কুফর' অর্থাৎ ছোটো কুফর, বড় কুফর নয়। এটি আমলগত কুফর, আকিদাহগত কুফর নয়।’[২০১]

---

১৯৯. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৪

২০০. আখবারুল কুদাহ, ১/৫২; মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৫২৬৬, আসসুন্নাহ লি ইবনি খাল্লাল : ১৪৩৪; সনদ সহিহ।

২০১. গুনাহের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কিছু গুনাহ এমন যে, কোনো ব্যক্তি তাতে জড়িয়ে পড়লেই তাকে তাকফির করা যাবে না, যতক্ষণ না সে এই গুনাহকে হালাল বা বৈধ মনে করে। যেমন চুরি, যিনা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি। কিন্তু এমনকিছু গুনাহ আছে যাতে লিপ্ত হলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে, কাজটাকে সে হালাল মনে করুক বা না করুক। যেমন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে গালি দেয়া, আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে কোনো বিধান প্রণয়ন করা ইত্যাদি। ইমাম ইবনু আবিল ইয আলহানাফি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ইমামগণ এমন হুকুমকে ব্যাপক আকারে প্রয়োগ করা এবং সার্বিকভাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত ছিলেন। কারণ,

গ. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু খারিজিদের ফিতনার সময় বেঁচে ছিলেন। এই খারিজি সম্প্রদায় কবিরা গুনাহ, সগিরা গুনাহ ও সামান্য থেকে সামান্য গুনাহের কারণে মানুষদের তাকফির করত। আরও অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, এরা সাহাবা কিরামদেরও কাফির বলত! তাই এ ধরনের বক্তব্য—যা খারিজিদের বিরুদ্ধে তাদের বদ আকিদাহর প্রতিরোধ হয়ে যায়—তখন খুবই দরকার ছিল। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু অমন ব্যাখ্যাই করেছিলেন। বর্তমানে মুসলিমরা যে অশুভ দর্শন ও ব্যবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে, ইসলামি আইনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে, যেভাবে কাফিরদের মতবাদ ও চিত্তপ্রলুব্ধ দর্শনগুলোকে নতুন একটি ধর্মব্যবস্থায় রূপ দিয়ে আল্লাহ-প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার বিপরীতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, আর এই নতুন অসার ধর্ম যেভাবে মানুষের মান-সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ এবং জান-রক্তের ওপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, সাহাবা ও তাবিয়িনের ওইসব অভিমত কখনোই এদের পক্ষে ছিল না।

আল্লাহ-প্রদত্ত শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ভিন্ন মতবাদ ও অসার নীতিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম অপতৎপরতাটি শুরু হয় তাতারিদের আক্রমণের সময়। যখন হালাকু খান চেঙ্গিস-প্রণীত 'আলইয়াসাক' নামক সংবিধানকে কুরআন- সুন্নাহর বিপরীতে প্রতিস্থাপন করতে তৎপর হয়ে ওঠে, সেই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ইমাম ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ বেঁচে ছিলেন। তখন তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ফাতওয়া দিলেন। এই আয়াত উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করে শোনালেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে?'[২০২]

আমরা কোনো গুনাহের কারণে কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলি না—যেমনটা খারিজিরা করে থাকে—বরং এভাবে হুকুম বর্ণনা করা হবে যে, আমরা যেকোনো গুনাহের কারণে কাউকে কাফির বলি না।' [শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়াহ, পৃষ্ঠা : ৩১৬] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ মাজমুয়ুল ফাতাওয়ায় (৭/৩০২) বলেন, 'যখন আমরা বলি, আহলুস সুন্নাহ একমত কাউকে গুনাহের কারণের তাকফির করা যাবে না, এ কথার দ্বারা বিভিন্ন কবিরা গুনাহই আমাদের উদ্দেশ্য। যেমন, ব্যভিচার ও মদপান ইত্যাদি। এসব গুনাহের কারণে কাউকে আমরা তাকফির করি না।' (অনুবাদক)

২০২. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৫০

ইমাম ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ওই ব্যক্তি ও তার বিধানকে অস্বীকার করছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অবতীর্ণ মহাকল্যাণকর ও অনিষ্টরোধকারী আয়াত এবং সুদৃঢ় বিধিবিধান থেকে বেরিয়ে কিছু প্রবৃত্তিতাড়িত আইন ও নিজেদের তৈরি করা অসার অকেজো কিছু পরিভাষার দিকে ঝুঁকে গেছে, যেগুলো আল্লাহর শরিয়াহ অনুমোদন করে না। যেমনটি করত জাহিলি যুগের লোকেরা; নিজেদের ভ্রান্ত-নীতিবাণী ও অজ্ঞতাপ্রসূত আইন দিয়ে বিচারকাজ পরিচালনা করত, যা তারা নিজেদের চাহিদা ও প্রবৃত্তিতাড়িত দর্শন দিয়ে তৈরি করেছিল। এভাবে তাতাররাও চেঙ্গিস খান থেকে নেয়া সংবিধান দিয়ে শাসন করত। 'আলইয়াসাক'-এর মাঝে তাদের সেই আইনগুলো সংরক্ষিত ছিল। এই ইয়াসাক হলো বিভিন্ন প্রথা ও আইন-বিধানের সমষ্টি, যেগুলো ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ছাড়াও বিভিন্ন রকমের নীতিশাস্ত্র থেকে নেয়া হয়েছে। এর মাঝে গ্রন্থিত হওয়া নিয়মপ্রথার বেশির ভাগই ছিল তাদের নিজস্ব প্রবৃত্তিতাড়িত মতবাদের প্রভাব, যা পরবর্তী সময়ে তার সন্তান-সন্ততি অনুসারী-অনুগামী সবার মাঝে একটি আইনশাস্ত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পায়। একে তারা কুরআন-সুন্নাহর আইন-কানুন ও বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের ওপরেও প্রাধান্য দিত। সুতরাং যে-ই তাদের মতো এমন জঘন্য কাজে লিপ্ত হবে, সে-ই কাফির বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরিহার্য, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান চিরন্তন শরিয়াতের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং ছোটো-বড় কোনো ক্ষেত্রেই একমাত্র আল্লাহর বিধান ছাড়া বিচার-ফায়সালা করা যাবে না।'[২০৩]

কুফরির জন্য কি জুহুদ ও ইস্তিহলাল শর্ত?

এই মতের আলিমদের দাবি হলো, এই আয়াতের মাঝে কিছু শব্দ উহ্য আছে। তাদের মতে আয়াতের অর্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানানুযায়ী বিচারকাজ পরিচালনা করবে না—কুরআন প্রত্যাখ্যানপূর্বক, নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা অস্বীকারপূর্বক—সে কাফির বলে গণ্য হবে। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ এই অভিমত পেশ করেছেন। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হাসান বাসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এ আয়াতটি সাধারণভাবে ওইসব ব্যক্তির ওপরই প্রযোজ্য হবে, যারা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করবে না, আবার একে নিজেদের আকিদাহর অংশ বানিয়ে নেবে এবং এমন অসার আইন দিয়ে বিচার করাকে বৈধ মনে করবে, চাই সে মুসলিম হোক, ইয়াহুদি হোক বা অন্য কোনো কাফির হোক।'[২০৪]

---

২০৩. তাফসির ইবনু কাসির, সুরা মায়িদার ৫০ নং আয়াতের তাফসির থেকে।

২০৪. তাফসিরুল কুরতুবি, ৬/১৯০ (ইয়াহইয়ায়ুত তুরাস, বৈরুত, হিজরি : ১৪০৫)

ইবনুল আরাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

إن حَكَم بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؛ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكَفْرَ وَإِن حَكَمَ بِهِ هَوًى وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى أَصْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْغُفْرَانِ لِلْمُذنبين

'কেউ যদি নিজের তৈরিকৃত আইন দিয়ে শাসন করে এবং এই দাবি করে যে, এটি আল্লাহ-প্রদত্ত আইন, তাহলে একে তাবদিল বা শরিয়াহ-বিকৃতি ধরা হবে; এটি এই কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিকে তাকফির করতে বাধ্য করবে। আর যদি সে প্রবৃত্তিতাড়িত ও পাপমূলক কর্মকাণ্ডের সাহায্যে শাসনকাজ পরিচালনা করে, তাহলে এটি কবিরা গুনাহ হবে; এটি ইস্তিগফারের মাধ্যমে ক্ষমার যোগ্য। গুনাহগারদের ক্ষমাপ্রাপ্তির ব্যাপারে এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি।'২০৫

এই মতের আলিমরা বলতে চান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির কুফরি সুস্পষ্ট প্রকাশ না পাবে—অর্থাৎ সে আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়াতকে অপসারণ করেছে বা দ্বীনকে শাসনব্যবস্থা থেকে একেবারেই উঠিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে এ কথাও স্বীকার করে না যে, সে দ্বীনকে ইনকার করে বা শরিয়াত অস্বীকার করে শরিয়াতকে সমূলে পরিত্যাগ করেছে—ততক্ষণ তাকে তাকফির করা যাবে না ।

খণ্ডন

১. প্রথম কথা, আয়াতের মাঝে যে কিছু শব্দ উহ্য ও গোপন আছে, এই দাবি করার জন্য কোনো না কোনো দলিল থাকতে হবে। অন্যথায় আয়াতের বাহ্য অর্থ থেকে কোনো ব্যাখ্যামূলক অর্থের দিকে যাওয়া যাবে না। কোনো আলামত ছাড়াই প্রকৃত অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থের দিকে যাওয়া বৈধ নয়। মূলনীতি হলো, আয়াতের বাহ্য অর্থই গ্রহণ করতে হবে যতক্ষণ না বাহ্য অর্থ থেকে ফেরানোর মতো কোনো আলামত পাওয়া যায়।

২. যদি কোনো ব্যক্তির কাজকর্ম ও আচার-আচরণ কুফরি ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তখন সেই ব্যক্তি কর্তৃক নিজেকে মৌখিকভাবে কাফির হওয়ার ঘোষণা দেয়া জরুরি নয়, বরং তার কাজকর্মই বলে দেবে এগুলো কুফরি। কারণ, সব আলিম একমত, যে ব্যক্তি মূর্তির সামনে সিজদাহ করবে সে কাফির। আর তার অন্তরে কী আছে না আছে আলিমগণ এগুলো জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ করেন না। এমনিভাবে যারা কুরআনুল কারিমকে কোনো নোংরা

২০৫. আহকামুল কুরআন, ৩/২১৩

স্থানে ছুড়ে ফেলবে সেও সর্বসম্মতভাবে কাফির। উস্তায হাসানুল বান্না রহিমাহুল্লাহ তাঁর **'আলউসূলুল ইশরিন'** রিসালাহয় বলেন,

'আমরা এমন কোনো মুসলিমকে কাফির বলব না, যে তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেয় এবং সে সাক্ষ্যের দাবি অনুযায়ী আমল করে, ফরয বিধানগুলো মেনে চলে, চাই রায় অনুযায়ী চলুক বা গুনাহে মত্ত হয়ে ইবাদত পালন করুক। তবে যদি কোনো কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে বা দ্বীনের অলঙ্ঘনীয় বিধানের কোনো একটিকেও অস্বীকার করে অথবা কুরআনুল কারিমের স্পষ্ট কোনো হুকুমকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে কিংবা এমন কোনো পথ ও পন্থায় ব্যাখ্যা করে, যা আরবি ভাষারীতির কোনো পদ্ধতিই সমর্থন করে করে না অথবা এমন কোনো কাজ করে, যার ব্যাখ্যা কোনোভাবেই কুফরি ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না, তাহলে তাকে কাফিরই বলতে হবে।'[২০৬]

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শরিয়াহর জায়গায় নেপোলিয়ান ও তার মতো যারা আছে তাদের তৈরি করা আইন-কানুন ও মতবাদ-দর্শন প্রতিস্থাপন করা এবং মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, মান-সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ ও রক্ত- মাংসের নিরাপত্তাদানে ওই বাদ-মতবাদগুলোকে একটি স্বতন্ত্র জীবনবিধানে রূপ দেয়া এমন একটি ঘৃণ্য কাজ, যাকে কুফরি ছাড়া অন্য কোনো হুকুম দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, এটি ওই বিচারকের মতো নয়, যে কিনা আল্লাহর শরিয়াহকে স্বীকার করে নিল, তারপর প্রবৃত্তির তাড়নায় বা ঘুষের লোভে অথবা আত্মীয়তার টানে আল্লাহর বিধানমতে বিচারের ফায়সালা দেয়নি; বরং এখানে বিষয়টি ওই ব্যক্তির মতো, যে কিনা আল্লাহর দ্বীনকে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং নতুন একটি দ্বীন মেনে নিল। পরিশেষে এই অসার ব্যবস্থাকে তরবারি আর বোমার আঘাতে আঘাতে মুসলিমদের গলায় লটকিয়ে দিলো, যেন মুসলিমরা এর সামনে নির্বাক আনুগত্য প্রকাশ করে একে স্বীকার করে নেয়।

৩. আপনি যদি ওইসব দলিল-প্রমাণ অনুসন্ধান করতে থাকেন—যেগুলো তারা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করছে—সম্ভবত আপনিও তাদের দলিলের জবাব দিতে পারবেন। দেখুন, তারা ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হাসান বাসরি রহিমাহুল্লাহর এই ভাষ্যের মাধ্যমে দলিল দিচ্ছে, 'এ আয়াতটি সাধারণভাবে ওইসব ব্যক্তির ওপরই প্রযোজ্য হবে যারা আল্লাহর আইন

২০৬. মাজমুয়াতুর রাসায়িল, পৃষ্ঠা : ১১

দিয়ে শাসন করবে না, আবার একে নিজেদের আকিদাহর অংশ বানিয়ে নেবে এবং এমন অসার আইন দিয়ে বিচার করাকে বৈধ মনে করবে, চাই সে মুসলিম হোক, ইয়াহুদি হোক বা অন্য কোনো কাফির হোক।'[২০৭]

এই যে শর্ত, 'একে নিজেদের আকিদাহর অংশ বানিয়ে নেবে এবং এমন অসার আইন দিয়ে বিচার করাকে বৈধ মনে করবে', এই শর্তটি মূলত ইবনু আব্বাস বা হাসান বাসরি কারোরই নয়; বরং এটি ইমাম কুরতুবির কথার অংশ। সুতরাং ইবনু মাসউদ ও হাসান আলবাসরির ভাষ্য বলে দলিল দেয়াই ভুল। আর তারা ইবনুল আরাবি রহিমাহুল্লাহর অভিমত দিয়ে যে দলিল দিয়েছেন, সেটি তাদের দলিল হওয়া সম্ভবই নয়, বরং সেটি আমাদেরই দলিল ও সাক্ষ্য। কারণ, ইবনুল আরাবি রহিমাহুল্লাহ বলছেন,

إِن حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ؛ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ

'কেউ যদি নিজের তৈরিকৃত আইন দিয়ে শাসন করে এবং এই দাবি করে যে, এটি আল্লাহ-প্রদত্ত আইন, তাহলে একে তাবদিল বা শরিয়াহ-বিকৃতি ধরা হবে; এটি এই কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিকে তাকফির করতে বাধ্য করবে।'[২০৮]

ইবনুল আরাবির বক্তব্যের দিকে একটু লক্ষ করুন, তিনি বলেছেন, এটিই হলো তাবদিল—দ্বীন-বিকৃতি, শরিয়াহ-পরিবর্তন—যাতে লিপ্ত হবার কারণে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। এই তাবদিল বা দ্বীনকে পরিবর্তনকরণ ও অপসারণ প্রক্রিয়া, অর্থাৎ দ্বীনকে পরিবর্তন করে এর স্থানে নতুন কোনো ব্যবস্থাকে রাখা কুফরি। এটি তাতবিক বা কেবল দ্বীন প্রয়োগকরণ—দ্বীন পরিবর্তন ও অপসারণের অর্থে নয়, যা তাবদিলের সংজ্ঞায় প্রবেশ করবে না এবং কুফরও হবে না। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব মানুষ এই তাবদিল তথা দ্বীনকে আমূল পরিবর্তন ও অপসারণের মতো মহারোগে সংক্রমিত হয়ে আছে; অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করে নতুন ধর্ম-মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং আল্লাহর শরিয়াহ অপসারণ করে নতুন নতুন ব্যবস্থাপনার আমদানি করা এবং আল্লাহ-প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা পরিত্যাগ করে মানবরচিত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সবই কুফরির মৌলিক কারণ। ইবনুল আরাবি রহিমাহুল্লাহ এটিই বলেছেন।

---

২০৭. তাফসিরুল কুরতুবি, ৬/১৯০

২০৮. আহকামুল কুরআন, ৩/২১৩

৪. ‘হাকিমিয়াহ-সংক্রান্ত উপর্যুক্ত আয়াতগুলো আহলুল কিতাবদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, আমাদের জন্য নয়', এই দাবির পর্যালোচনা। যারা এ ধরনের তাবিলের দিকে পা বাড়িয়েছেন, তারা এসব নস দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন যে, দাহহাক থেকে বর্ণিত, ‘যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা বিচারকাজ পরিচালনা করে না, তারাই কাফির, ...যালিম, ...ফাসিক।' এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে আহলুল কিতাবদের বিরুদ্ধে।'[২০৯] আবু সালিহ থেকে বর্ণিত, ‘এই আয়াতের কোনো অংশই মুসলিমদের ব্যাপারে নয়, বরং এটি আহলুল কিতাবদের ব্যাপারে।'[২১০]

আবু মিজলায় লাহিক ইবনু হামিদ আশশাইবানি আসসাদুসির কাছে বনু আমর ও বনু সাদুসের কিছু লোকজন এসে জিজ্ঞেস করল, “হে আবু মিজলায, আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এই আয়াতের—যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইনব্যবস্থা দিয়ে শাসন করবে না, তারা কাফির, ... তারাই যালিম, তারাই যালিম, ...তারাই ফাসিক–ব্যাপারে কী বলেন? এটি কি ঠিক আছে?” তিনি বললেন—হাঁ। তারা জিজ্ঞেস করল, ‘তাহলে কি তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ আইন-কানুন দিয়ে বিচার-ফায়সালা দেবে?' তিনি জবাব দিলেন, ‘এটি তাদের আঁকড়ে ধরা দ্বীন। তারা এর বাণী প্রচার করে, এই দ্বীনের দিকেই আহ্বান করে। তারা যদি এর বিন্দু পরিমাণ ছেড়ে দেয় তবে গুনাহে লিপ্ত হবে।' তখন তারা বলে উঠল—কখনো নয়, বরং আপনি এর সঠিক বিধান বলতে ভয় পাচ্ছেন। তিনি বললেন, “আমার চেয়ে তো তোমরাই বেশি নমনীয় ও ভীত। এই আয়াতটি অবশ্যই ইয়াহুদি-নাসারা ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে নাযিল হয়েছে।'[২১১]

তাদের চতুর্থ দলিলটি বারা ইবনু আযিব, হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান, ইবনু আব্বাস, আবু মিজলায, আবু রাজা, ইকরিমাহ ও হাসান আলবাসরি থেকে বর্ণিত হয়েছে।

দলিল-খণ্ডন

১. আয়াতটিতে من শব্দের মাধ্যমে অর্থের মাঝে ব্যাপকতা এসেছে। কারণ, من শব্দটি অর্থের ব্যাপকতার জন্য শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর তাফসিরশাস্ত্রের মুলনীতি হল-

العبرة بعُمُوم اللفظ، لا بخُصُوص السَّبَب

‘শব্দের ব্যাপকতাই গ্রহণযোগ্য, বিশেষ প্রেক্ষাপটের সাথে হুকুমকে নির্দিষ্ট করা যাবে না।'

---

২০৯. তাফসির তাবারি, ১০/৩৪৬; ইবনু কাসির, ২/১৬

২১০. প্রাগুক্ত

২১১. প্রাগুক্ত

কারণ, চুরির শাস্তিবর্ণিত আয়াত নাযিল হয়েছিল সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাদর বা ঢাল চোরের ব্যাপারে। হিলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল লিয়ানের'২১২ আয়াত। যিহারের'২১৩ আয়াত নাযিল হয়েছিল খাওলাহ বিনতু সালাবাহ ও তাঁর স্বামী আওস ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ব্যাপারে। সুতরাং আমরা যদি কুরআনের আয়াতের বিধানকে তার সাবাবুন নুযুল বা অবতীর্ণকালীন প্রেক্ষাপটের সাথে সীমাবদ্ধ করে ফেলি, তাহলে বলতে হয়, কুরআনের প্রায়োগিক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট একটি সময়, ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী ছাড়া কারও ওপরই প্রযোজ্য নয়! কুরআনি বিধানের বাস্তবায়ন শুধু অবতীর্ণকালীন প্রেক্ষাপটের মাঝেই আবদ্ধ থাকবে; অথচ কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ-প্রদত্ত এমন এক অনন্য সংবিধান, যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কুরআনের বিধানগুলো 'আলফাযু আম্মাহ' তথা ব্যাপক শব্দমালার মাধ্যমে এবং 'মুতলাকান নুসুস' তথা 'ব্যাপক প্রয়োগযোগ্য দলিলাদির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি যত সমস্যা ও প্রতিকূলতার শিকার হবে, সবক্ষেত্রে কুরআনের হুকুম যেন বাস্তবায়ন করা যায় এবং সব সমস্যার সমাধান করা যায়, এ জন্য আয়াতের শব্দ ও ভাষ্যগুলো ব্যাপক রাখা হয়েছে।

২. আহলুল কিতাবদের জন্য এই আয়াতগুলো খাস করতে হলে এমনসব দলিল- প্রমাণের প্রয়োজন, যা তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করবে, তাদের ভাষ্যকে প্রাধান্য দেবে। কারণ, কোনো

---

২১২. স্বামী যদি স্ত্রীর উপর যিনার অভিযোগ করে এবং সাক্ষী বা প্রমাণ দ্বারা সেই অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে প্রথমে স্বামী পাঁচবার এই বলে সাক্ষ্য দেবে যে, 'আমি আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার যে অভিযোগ করেছি সে ব্যাপারে আমি অবশ্যই সত্যবাদী।' এভাবে চারবার বলার পর পঞ্চমবার বলবে, 'আমি আমার স্ত্রীর উপর যিনার যে অভিযোগ করেছি এ ব্যাপারে যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তাহলে আমার ওপর আল্লাহর লানত।' এভাবে স্ত্রীও চারবার বলবে যে, 'আমার স্বামী আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে এ ব্যাপারে সে মিথ্যাবাদী।' তারপর পঞ্চমবার বলবে, 'আমার স্বামী আমার ওপর যিনার যে অভিযোগ করেছে এ ব্যাপারে যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে আমার ওপর আল্লাহর লানত।' এভাবে সাক্ষ্য দেয়াকে 'লিয়ান' বলা হয়। (অনুবাদক)।

২১৩. নিজ স্ত্রীকে আপন মায়ের দেহ বা দেহের কোনো অঙ্গের সাথে এই বলে তুলনা করা যে, তোমার অমুক অঙ্গটি আমার মায়ের মতো বা তোমার অমুক অঙ্গ আমার কাছে আমার মায়ের মতো অথবা তুমি আমার কাছে আমার মায়ের মতোই হারাম। এই নিয়তে বলবে যে, তার মা যেভাবে তার জন্য হারাম, তেমনি স্ত্রীও তার জন্য হারাম। একে যিহার বলা হয়। (অনুবাদক)

কারণ-উপকারণ ছাড়াই কোনো আয়াতকে নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সীমাবদ্ধ করার মানে হলো ওই আয়াতকে তার বাহ্য অর্থ থেকে বের করে দেয়া, যা বৈধ নয়।

৩. এ ক্ষেত্রে সাহাবা কিরাম ও তাবিয়িনের প্রচুর বর্ণনা আছে, যেগুলো আয়াতের হুকুমের ব্যাপকতার প্রমাণ বহন করে এবং কোনো কাল-যুগ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে খাস না হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

ক. এক লোক হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করল যে, 'এই আয়াতটি কি বনু ইসরাইলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে?' তখন তিনি বললেন, 'হাঁ, এটি তোমাদের ভাই বনু ইসরাইলিদের জন্য নাযিল হয়েছে। তবে শর্ত হলো, যদি মনে করো সব তিক্ততা বনু ইসরাইলের জন্য আর সব মিষ্টতা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তাহলে আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জুতোর ফিতা পরিমাণ পর্যন্তও তাদের পথ অনুসরণ করবে।' অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা তাদের প্রতিটি আচার- আচরণ, স্বভাব-রুচিবোধ পর্যন্ত অনুসরণ করবে, পদে পদে তাদের অনুসরণ করবে।'[২১৪] অর্থাৎ তিনি বিস্মিত হয়েছেন, যেসব মুসলিম এই আয়াতগুলো আহলুল কিতাবদের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, তাদের মাথা থেকে এ কথা কীভাবে উধাও হয়ে যায় যে, আহলুল কিতাবদের তাওরাত-ইনজিল নিষ্ক্রিয় করার কারণ একটিই—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শরিয়াহ প্রত্যাখ্যান করা এবং তাঁর শরিয়াহর গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া! তাওরাত ধ্বংস করে দিয়েছে, তাওরাতের বিধান অকার্যকর করে তুলেছে বলে কোনো ব্যক্তি ইয়াহুদিদের কাফির বলবে, কিন্তু সরাসরি কুরআনি শরিয়াহকে ছুড়ে ফেলা নামধারী মুসলিমদের কাফির বলবে না, এটি তো মোটেও ইনসাফের কথা হতে পারে না।

তাই হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই শর্ত দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি মনে করো সব তিক্ততা ইয়াহুদিদের জন্য আর সব মিষ্টতা তোমাদের জন্য, তাহলে মনে করতে পারো এই আয়াত বনু ইসরাইলের জন্য নির্দিষ্ট।' অর্থাৎ কী অদ্ভুত ব্যাপার যে, তারা তাদের শরিয়াহ প্রত্যাখ্যান করে কাফির হয়ে গেছে আর তোমরা নিজেদের শরিয়াহ নিশ্চিহ্ন করেও মুমিন থেকে যাবে। এটি তো বড় অসম বিভাজন!

---

২১৪. আহকামুল কুরআন, ৪/৯৩; তাফসির আবদির রাযযাক, ১/১৫৫; ফাতহুল কাদির, ২/৪৫

খ. ইমাম শাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতে বর্ণিত 'তারাই কাফির' এটি মুসলিমদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। 'তারাই যালিম' এটি ইয়াহুদিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর 'তারাই ফাসিক' এটি খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে বলা হয়েছে।'২১৫ ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু যায়িদ, ইবনু যায়িদাহ, আবু শুবরামাহ এবং আবু বকর ইবনুল আরাবি রহিমাহুল্লাহ এই মতই গ্রহণ করেছেন।

গ. হাসান আলবাসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

نَزَلَتْ فِي الْيَهُود وَهِيَ عَلَيْنَا وَاجِبَة

'এটি যদিও ইয়াহুদিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তবে আমাদের ওপরও আবশ্যক।'২১৬

ঘ. ইবরাহিম আননাখয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই আয়াতটি বনু ইসরাইলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই উম্মাহর জন্যেও তা পছন্দ করেছেন।'২১৭

ঙ. ইবনু মাসউদ ও হাসান আলবাসরি বলেন, 'এ আয়াতটি সাধারণভাবে ওইসব ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য হবে, যারা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করবে না। চাই সে মুসলিম হোক, ইয়াহুদি হোক বা অন্য কোনো কাফির হোক।'২১৮

চ. সুদ্দি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জোর-করে আল্লাহর নাযিলকৃত আইন দিয়ে শাসন না করে, সে কাফির। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, এসব আয়াতকে আহলুল কিতাবদের সাথে খাস করা এবং এমনভাবে ব্যক্ত করা কোনো মুসলিমের অধিকার নেই যেন আয়াতগুলো কোনোভাবেই মুসলিমদের শামিল করে না।'২১৯

ছ. যারা এসব দলিল দিয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করে,উস্তায মাহমুদ শাকির তাফসিরুত তাবারির একটি টীকায় তাদের খণ্ডন করেছেন।তিনি আবু মিজলাযের বর্ণনার ব্যাপারে বলেন,'বনু

---

২১৫. তাফসিরুত তাবারি, ১০/৩৫৪

২১৬. আহকামুল কুরআন, ৪/৯৩

২১৭. তাফসির ইবনু কাসির, ৩/১১৯

সাদুসের খারিজিরা যে প্রশ্ন করেছিল—আমাদের কালের এই বিদয়াতিরা যেগুলো দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে—সেগুলো মোটেও সে সম্পর্কে ছিল না। কারণ, এই যামানার বিদয়াতিরা মানুষের ধন-সম্পদ, ভিটে- মাটি, আসবাবপত্র, জানমালের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য তো এমনসব আইন-কানুনের কথা বলে, যেগুলো মূলত মুসলিমদের দ্বীনি শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। আর খাওয়ারিজদের প্রশ্নগুলো আদতে মুসলিমদের জন্য নতুন কোনো কুফরি আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রয়োগের বিষয়ে ছিল না।

সুতরাং যারা এমন নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রয়োগের আওয়াজ উঠাবে, তারা মূলত আল্লাহর আইনব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং আল্লাহ-প্রদত্ত মহান দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের প্রীতি ও অনুরাগকে হত্যা করল, আল্লাহ-প্রদত্ত শাসনব্যবস্থার ওপর আল্লাহ-অবিশ্বাসী কাফিরদের শাসনব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিলো। এটি সুস্পষ্ট কুফরি। এমন শাসনব্যবস্থার প্রবক্তা ও তার দিকে আহ্বানকারীদের তাকফিরের ব্যাপারে কোনো মুসলিমই সন্দেহ করতে পারে না। কিন্তু আমরা বর্তমানে যে সময়টাতে বসবাস করছি, এখানে আল্লাহর শরিয়াহকে ব্যাপক হারে পরিত্যাগ করা হচ্ছে, আল্লাহ-প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার ওপর মানবরচিত আইন- বিধানকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে; অথচ ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। যত মুসলিম শাসক শাসন করেছেন, তারা শরিয়াতকে শাসনব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য মনে করেছেন। হয়তো কোনো শাসক কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরিয়াতের বিধান ছেড়ে শাসন করেছেন। হয় সে এমনটি করেছে অজ্ঞতার কারণে, ফলে তার এই কাজটি শরিয়াহর বিধান না জানার ওজর হবে অথবা সে এমনটি করেছে প্রবৃত্তির তাড়নায়, ফলে এটি কবিরা গুনাহ হবে, যা তাওবাহ ও ইসতিগফারের মাধ্যমে শোধরে যাবে। হয়তো সে কুরআনের কোনো বিধানকে ব্যাখ্যাপূর্বক এমনটি করেছিল, যেটি তার যুগের আলিমগণ মেনে নেননি। তাহলে তার এই কাজটি ওইসব ব্যাখ্যার মতোই হবে, যা কুরআন-সুন্নাহ থেকে উদ্‌গত ধারণা থেকে নেয়া হয়েছে। আর আবু মিজলাযের যুগ বা তার আগে-পরের যুগে এমন কোনো শাসক ছিল না, যে শাসক শরিয়াতের কোনো একটি হুকুমকে অস্বীকারপূর্বক নতুন কোনো হুকুম জারি করেছিলেন, অথবা শরিয়াতের কোনো হুকুমের ওপর কাফিরদের তৈরি করা হুকুমকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।'[২২০]

---

২১৮. তাফসিরুল কুরতুবি, ৬/১৯০

২১৯. তাফসিরুস সুদ্দি, পৃষ্ঠা : ২৩০

২২০. তাখরিজ তাফসির আততাবারি, ১০/৩৪৯-৩৫৮

সারসংক্ষেপ

যদি কোনো ব্যক্তি এমনসব মানবরচিত জীবনদর্শনের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে—যেসব ব্যবস্থা কোনো এক মুহূর্তের জন্য হলেও আল্লাহর শরিয়াত ও নান্দনিক জীবনশৈলীর সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বাধায়—সেই ব্যক্তি তখনই আল্লাহর দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে; চাই এই নব্যধর্মের প্রতি তুষ্টি প্রকাশকারী শাসক হোক বা আইন-প্রণয়নকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার কোনো সদস্য হোক বা পরামর্শদাতা হোক কিংবা সেই ব্যবস্থার কোনো বিচারক হোক অথবা সমর্থনকারী সাধারণ কোনো লোক হোক। তবে ওইসব জনসাধারণের ব্যাপারে—যারা এই শাসনব্যবস্থার প্রতি বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও সে অনুযায়ী আমল করে অথবা এর কাছে বিচার-ফায়সালা নিয়ে যায়—আমরা আল্লাহর কাছে আশা রাখি, তিনি আমাদের সবার হৃদয়ে সত্য ও সঠিক বিষয়টি ঢেলে দেবেন। আমার অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, এই ব্যাপারে আমি যতটুকু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি—আসলে এ ব্যাপারে মানুষের বিভিন্ন স্তর হবে।

১. যেসব শাসক আল্লাহর দ্বীন-শরিয়াতকে পরিবর্তন ও অপসারণের আদেশ দেয় এবং শরিয়াতের স্থানে নতুন দর্শন ও ব্যবস্থা নিয়ে আসে, এই ঘৃণ্য কাজের মাধ্যমে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যাবে। কারণ, সে আল্লাহর কালাম ও আইন-নির্দেশের ওপর মানুষের আদেশ-নির্দেশকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, প্রাধান্য দেয় এবং অগ্রগণ্য করে। সে বিশ্বাস করে, আল্লাহর কানুনের চেয়ে মানুষের তৈরি কানুনই সমাজ, সভ্যতার জন্য বেশি উত্তম। এরাই হলো ওইসব জঘন্য লোক, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঘোষণা করছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, অবশ্যই তারা তোমার প্রতি এবং তোমার আগে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ইমান এনেছে। কিন্তু তারা তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালা নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাগুতকে অস্বীকার করতে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান চায় তাদের ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।’[২২১]

---

২২১. সুরা নিসা, ৪ : ৬০

তাদের ইমান হলো স্রেফ ধারণা, মিথ্যা। তাদের ইমানের দাবি সত্য নয়। কারণ, ইমানের হাকিকত কখনো তাগুতের কাছে অর্থাৎ আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইনের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে দেয় না; বরং ইমানের হাকিকত তো এটাই শেখায় যে, এসব আইন-কানুনকে অস্বীকার করতে হবে, বাতিল ঘোষণা করতে হবে, প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

২. যে আইনপ্রণয়নকারী সদস্য আল্লাহর দ্বীনের বিপরীত আইন তৈরি করে, সে মূলত নতুন একটি দ্বীন তৈরি করে, আর এ কারণে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। কারণ, যখন সে আল্লাহর নাযিলকৃত আইন ছেড়ে মানুষের জন্য নতুন কোনো আইন-কানুন বা সংবিধান তৈরি করে, তখন সে নিজেকে সরাসরি আল্লাহর উলুহিয়াতের মাঝে শরিক করে।

لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن به الله

'তাদের কি এমন শরিক আছে, যারা তাদের জন্যে এমন বিধান সিদ্ধ করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'২২২

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

'তারা (ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান) তাদের যাজক ও পুরোহিতদের এবং মারিয়ামপুত্র মাসিহকেও আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।'২২৩

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রুবুবিয়াতের কর্তৃত্ব দেয়ার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, তাদের ধর্মবেত্তা ও সাধু-সন্ন্যাসীরা হালাল বিধানকে হারাম করত এবং হারাম বিধানকে হালাল করে দিত।

আদি ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে এসেছে, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'আমরা তো ধর্মগুরু ও সাধু-সন্ন্যাসীদের ইবাদত করতাম না।' তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হাঁ, কিন্তু তারা তোমাদের জন্য আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম আর আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল বলে ঘোষণা দেয়ার পর তোমরা কি সেগুলো মেনে নাওনি?' তখন তিনি বললেন, 'হাঁ, নিয়েছিলাম।' নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এতেই তো তাদের মাবুদের আসনে বসানো হলো।'২২৪

---

২২২. সুরা শুরা, ৪২ : ২১

২২৩. সুরা তাওবাহ, ৯ : ৩১

২২৪. সুনানুত তিরমিযি : ৩০৯৫, সুনানুল বাইহাকি : ২০৮৪৭

৩. **আইনপ্রণয়ন সংস্থা**—যারা এমনসব আইন চালু করে, যেগুলো আল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এমন আইন যারা তৈরি করবে তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে ছিটকে পড়বে। সুতরাং সেই সংস্থার কোনো মুসলিম সদস্যের জন্য এমন কোনো আইনের প্রতি নিজের সম্মতি প্রকাশ করা বৈধ নয়, যার কিয়দংশও আল্লাহর আইনের সাথে বিরোধ রাখে।

৪. **বিচারক**—যারা আল্লাহর আইন ছেড়ে মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার- ফায়সালার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে ছিটকে না পড়লেও তাদের কাজ, শ্রম ও সেবাপ্রদান এমনকি তাদের সব বেতন-ভাতা শ্রমমূল্য সবই হারাম। কারণ, সে একটি হারাম কাজের দায়িত্ব পালন করছে। সে ওই ব্যক্তির মতো, যে কিনা কোনো সুদি ব্যাংকের পরিচালকের দায়িত্বে আছে বা কোনো মদের বারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছে কিংবা কোনো জুয়ার আসরের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে, যদি এসব অবৈধ আইনের প্রতি সন্তুষ্টি, সম্মতি ও একাত্বতা প্রকাশ করে তাহলে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহদ্রোহী আইন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি সন্তুষ্টি ও একাত্বতা প্রকাশ করলে মুসলিম মিল্লাত থেকে সে ছিটকে পড়বে, চাই সে যে-ই হোক না কেন।'[২২৫]

৫. **আইনজীবী**—যেসব উকিল বা আইনজীবী অনৈসলামিক ব্যবস্থার বিচারকদের সামনে মোকাদ্দমা পেশ করে, তাদের ব্যাপারে উলামা কিরাম ও আধুনিক কালের আলিমরা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের মতে ওকালতি পেশা কয়েকটি শর্তে বৈধ হবে,

(ক) আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ অধ্যয়ন থাকতে হবে এবং এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমি আমার মক্কেলের অধিকার নিয়ে লড়ছি।

(খ) শরিয়াহ-বিরোধী আইনে কোনো মামলায় লড়া যাবে না। যেমন- ব্যভিচার, চুরি, সুদ ও হত্যা।

(গ) আইনজীবীকে মামলা পরিচালনা থেকে তখনই বেরিয়ে যেতে হবে, যখন সে বুঝতে পারবে,তার মক্কেল অপরাধী ও মিথ্যাবাদী। আর কেউ কেউ বলেছেন, বর্তমানে ওকালতি পেশা হারাম।কারণ, অবশেষে সে-ও তো তাগুত ও অনৈসলামিক বিচারব্যবস্থার কাছেই বিচারিক

---

২২৫. আল্লামা আহমাদ শাকির রহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিঃসন্দেহে এই নব্য তাতার শাসনব্যবস্থার অধীনে বিচারক হওয়া একেবারেই বাতিল। এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া কোনোক্রমেই বৈধ নয়, সহিহ নয়।' [উমদাতুত তাফসির, ৪/৪৭১]

কার্যক্রম উত্থাপন করে এবং আল্লাহ-প্রদত্ত বিধান বাদ দিয়ে যারা বিচার করে তাদের সম্মানপ্রদর্শন করে। আবার কখনো কখনো তো বিচার-শুনানিতে প্রচুর বাড়াবাড়ি অতিরঞ্জন এবং অনৈতিক হুমকি-ধমকি ও ভীতিপ্রদর্শনওঅনুপ্রবেশ করে। আর এগুলো করতে তারাও বেশ আনন্দ ও সাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৬. **সাধারণ জনগণ**—যারা তাগুত ও অনৈসলামিক কোর্টের কাছে নিজেদের মোকদ্দমা ন্যস্ত করে। যদি জনগণ এ ব্যাপারে স্বাধীন ও অধিকারপ্রাপ্ত থাকে যে, তারা চাইলে ইসলামি কোর্টেও বিচার নিয়ে যেতে পারে, আবার চাইলে অনৈসলামিক ব্যবস্থার কাছেও বিচারের ভার ন্যস্ত করতে পারে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি যে ধরনের বিচারব্যবস্থার কাছে নিজের মোকদ্দমা দায়ের করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। যেমনটি করেছিল হালাকু খাঁর সময়কালের জনগণ। হালাকু খাঁ দুই প্রকারের বিচারক নিয়োগ দিয়েছিল। সব জায়গায় দুধরনের বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। একটি ছিল 'আলইয়াসা' বিচারালয়—তাতারদের রচিত আইন- কানুন। আরেকটি ছিল কুরআনি বিচারালয়। সুতরাং যেসব লোক সে সময়ে আলইয়াসার কাছে নিজেদের মোকদ্দমা ন্যস্ত করেছিল তারা সবাই কাফির হিসেবে গণ্য হবে এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যাবে। ইমাম ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাহলে ওই ব্যক্তি কেন কাফির হবে না, যে আলইয়াসার কাছে ফায়সালার ভার ন্যস্ত করে এবং শরিয়াহর ওপর সেটাকে প্রাধান্য দেয়? নিশ্চয়ই মুসলিমদের ঐক্যমতে সে কাফির।'[২২৬]

কিন্তু বর্তমান সময়ে তাগুতি আইন ও ব্যবস্থা মানুষের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্বে পর্বে, অধ্যায়ে অধ্যায়ে এর ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। মানুষ নিজেদের অধিকার আদায়ে একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাগুতি বিচারব্যবস্থার কাছে বিচারিক ভার ন্যস্ত করছে। তাই এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ 'মুদতার' বা একান্ত অপারগ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হবে। আল্লাহ এদের অপারগতার কারণে গুনাহ মাফ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। যেহেতু উত্তম হচ্ছে মুসলিমরা তাদের হক বা প্রাপ্যগুলোও আদায় করা থেকে বিরত থাকবে, যেন তাগুত ও কাফিরগোষ্ঠীর কাছে কোনো বিচারের ভার ন্যস্ত করতে না হয়। সাইয়িদ মাওদুদি ও উস্তায হাসানুল বান্না রহিমাহুমাল্লার ঝোঁক-প্রবণতাও এদিকেই ছিল। তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের হিফাযত করুন।

---

২২৬. আলবিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ, ১৩/১৩৯

পরিশেষে তাঁর শরিয়াহ ও নান্দনিক জীবনশৈলীর নির্মল ছায়ায় সব ক্লান্তি, অবসাদ দূর করার তাওফিক দান করুন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহর একটি অসাধারণ ও চমৎকার বক্তব্য দিয়ে আমরা এ আলোচনার সমাপ্তি টানবো। যারা নিজেদের বিচার ফায়সালার ভার বেদুইনদের রসম-রেওয়াজ, গোত্রীয় প্রথা-ব্যবস্থা ও তাগুতদের বিচারব্যবস্থার প্রতি ন্যস্ত করে, তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

'আল্লাহ তাঁর নবির ওপর যে বিধান নাযিল করেছেন, তা দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা যে ব্যক্তি আবশ্যক মনে করবে না, নিশ্চয় সে কাফির। পৃথিবীর সব জনগোষ্ঠী ও মতবাদ সবাই কিছু না কিছু ন্যায়-ইনসাফ এবং কল্যাণের কথা বলে। তাদের ধর্মে ন্যায়-ইনসাফ সেটিই হয়, যেটি তাদের ধর্মগুরুরা মনে করে এবং নির্ধারণ করে। অসংখ্য লোক আছে, যারা ইসলামের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে ঠিকই, কিন্তু বিচার-ফায়সালা করে নিজেদের স্বভাব-রুচিবোধ অনুযায়ী—যেভাবে আল্লাহ শাসনের অনুমতি দেননি, সেভাবেই শাসনকাজ পরিচালনা করে। যেমন, বেদুইনদের প্রাচীন উপাখ্যান, যা দিয়ে তারা শাসন কাজ চালাত। তারা বিশ্বাস করত, কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া যা ইচ্ছে তা দিয়ে শাসনকাজ চালানো যায়। আর এটাই হলো কুফরি। বিপুল পরিমাণ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তারা নিজেদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের প্রাচীনতম স্বভাব-চরিত্র ও রীতি- রেওয়াজ দিয়েই শাসনকাজ পরিচালনা করত। কোনো মানবীয় চিন্তাদর্শন ও প্রথা- রেওয়াজ দিয়ে শাসন করা বৈধ নয় এবং আল্লাহ-প্রদত্ত শাসনরীতি দিয়েই শাসন করতে হবে, তারা যদি এ কথা বোঝার পরও আল্লাহর নীতিবিরুদ্ধ দর্শন ও ব্যবস্থা দিয়েই শাসন করাকে হালাল মনে করে, তাহলে তারা অবশ্যই কাফিরে পরিণত হবে।'[২২৭]

তবে চমৎকার হবে যদি আমরা এমন এক ব্যক্তির অভিব্যক্তি দিয়ে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানি, যিনি এসব মানবরচিত আইনব্যবস্থা খুব কাছে থেকে দেখেছেন এবং সেই পরিবেশেই বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি হলেন শহিদ আবদুল কাদির আলআওদাহ রহিমাহুল্লাহ (১৯০৬-১৯৫৪ ই.)। তিনি বলেন, 'একজন মুসলিম কখনোই আল্লাহর কাছে মুসলিম বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের সব পরিস্থিতিতে ইসলামকেই ফায়সালাদানকারী নির্বাচন করবে এবং পারস্পরিক

---

২২৭. মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫/১৩০

দ্বন্দ্ব -সংঘাতে ইসলামকেই মীমাংসা ও সমাধানের মাপকাঠি নির্ধারণ করবে। যেন সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এই বাণীকে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করতে পারে,

فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সঙ্কীর্ণতা মুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।'[২২৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ-প্রদত্ত আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে না, বরং শরিয়াহ-বিরোধী শাসনব্যবস্থার কাছে বিচারের দ্বারস্থ হবে, সে কাফির। তার অন্তরে বিন্দুমাত্রও ইসলামের অস্তিত্ব নেই; যদিও তাকে মুসলিম নামে ডাকা হয় এবং বংশগতভাবে মুসলিম বাবা-মায়ের পরিচয়ে বড় হয়, এমনকি নিজের ব্যাপারে ইসলামের দাবি করলেও। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হচ্ছে এই,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।'[২২৯]

এটিই যেহেতু ইসলামের শাসনবিধান—যা প্রতিনিয়ত নিষ্ক্রিয় হয়েই চলছে এবং বিশ্বজুড়ে মুসলিম দেশে দেশে বিভিন্ন প্রকার দর্শন-মতবাদ, শাসনরীতি ও রাষ্ট্রতত্ত্ব একে অপসারণ করে চলেছে—তখন যেকোনো জ্ঞানী মাত্রই বুঝতে পারবে যে, ওইসব দর্শন-মতবাদ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামের সাথে কতটুকু সম্পর্ক রাখে। আর কোনো দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই বলতে পারবে যে, এসব আইনব্যবস্থা, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও নীতিভ্রষ্ট সাম্রাজ্যগুলো মুসলিমদের প্রতিনিয়ত আল্লাহদ্রোহিতার দিকে প্ররোচিত করছে এবং সেদিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'[২৩০]

---

২২৮. সুরা নিসা, ৪ : ৬৫

২২৯. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৪

২৩০. আলইসলাম ওয়া আওদায়ুনাল কানুনিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১৭

অষ্টম অধ্যায়

আকিদাহ শুদ্ধি ও অশুদ্ধি : পরিণাম-পরিণতি

মানবসভ্যতা আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়াত ছেড়ে কোথায় গিয়ে পড়েছে? নিজেদের গলা থেকে ইসলামের কল্যাণময় আনুগত্যের বন্ধন ছুড়ে ফেলে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? তারা তো সুনিশ্চিত কোনো আকিদাহ-বিশ্বাস এবং পরিশুদ্ধ কোনো দর্শনের ভেতর নিজেদের নিরাপদ রাখেনি। তারা চরিত্র-নৈতিকতা, দ্বীন-ধর্ম, চিন্তা-চেতনা এবং সব রেওয়াজ-প্রথাকে সংস্করণের ডাক দিয়েছিল। আজ এর করুণ পরিণতি তারা তো দেখতেই পাচ্ছে। বস্তুবাদী ভোগ-উপকরণে সমৃদ্ধ দেশগুলোতে এর ভয়াবহ প্রভাব আর ভয়ঙ্কর পরিণতি আছড়ে পড়ছে। যার নমুনা, একদিকে তাদের অর্থনীতি আকাশচুম্বী ঠিকই, কিন্তু অন্যদিকে অসম বন্টনরীতির ফলে ভয়াবহ দরিদ্রতার প্রাদুর্ভাব। একদিকে বিলাসিতার উন্মত্ত ঢেউ, অন্যদিকে দরিদ্রদের ভেতরে ভেতরে প্রতিহিংসার তীব্র আত্মক্রোধ; যা তাদের সমাজব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং তাদের সমাজব্যবস্থার বিন্যাসকে মুহূর্তেই ধ্বসিয়ে দেবে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। দমন-পীড়ন, খুন-গুম, ত্রাস ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এমন এক সম্প্রদায়ের মাঝে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, যাদের নেতৃবর্গ বণ্টন-সমতার আওয়াজ তুলত। তাদের পথঘাটগুলো পরিণত হয়েছিল কসাইখানায়। রক্তবন্যায় তাদের রাস্তাঘাট পিচ্ছিল হয়ে উঠেছিল। এমনকি একচতুর্থ শতাব্দীর মতো সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ছাব্বিশ লক্ষ মুসলিম প্রাণ হারায়। এক বছর কয়েক মাসে এক মিলিয়ন মানুষের বাস্তুচ্যুত হবার মতো ঘটনা ঘটে। যুগোশ্লোভিয়ায় এক মিলিয়ন মুসলিম কমে যায়। ক্রমাগত আত্মিক অবনতি, নৈতিক অবক্ষয় তাদের বস্তুতান্ত্রিক জীবনকে প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত করেছে। কারণ, যেকোনো সমাজ-সভ্যতা ও জীবনদর্শনের জন্য এমনকিছু উপকরণ ও নীতিমালা চাই, যা সমাজ- সভ্যতাকে রক্ষা করবে। চাই এমনসব স্বভাব ও রুচিবোধ, যা সেই দর্শনকে টিকিয়ে রাখবে। যখন কোনো জনগোষ্ঠী মুক্ত যৌনতার কাদামাটিতে লেপটে যায়, জন্তু-জানোয়ারের উন্মাদনায় সংক্রমিত হয়

তখন সেই সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়তে বাধ্য। ইতিহাসই এর উত্তম সাক্ষী। এথেন্স যখন থেকে প্রবৃত্তি আর আত্মপ্রমোদের পুজো-অর্চনা শুরু করেছিল, পৃথিবীর মানচিত্রে মলিন হয়ে গেছে।

এমনিভাবে রোমান সাম্রাজ্যও ধ্বসে পড়েছিল অথচ এই বিশাল দাপুটে সাম্রাজ্য নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল হাজার বছর। এর ভেতর প্রাণ সঞ্চার করতে সময় লেগেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। কিন্তু ভ্যান্ডাল ও এ্যালান্সের কয়েকটি বর্বর সম্প্রদায়ের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে রোমানরা মুখ থুবড়ে পড়ে, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। আর এমনটি ঘটেছিল যখন রোমানরা ভ্যানিসের মতো একজন ব্যভিচারিণীকে সৌন্দর্যের দেবী বলে ঘোষণা দেয়। বাখুসের মতো উন্মাদ মাতালকে কামের দেবতা বলে মেনে নিয়েছিল। আরেকজন রোমান দেবতা কিউপিড। তার ব্যাপারে গ্রিকপুরাণে অনেক মিথগল্প ছড়ানো আছে। সে ছিল আরেক গ্রিকদেবী আফ্রোদিতির সন্তান। আফ্রোদিতি ছিল গ্রিকদের প্রেম ও ভালোবাসার দেবী, যে কিনা তিন-তিনজন দেবতার সাথে যৌনক্রিয়ায় মেতে উঠেছিল। তাই কিউপিডও তার মায়ের মতো প্রেমের দেবতার স্থান পায়।

স্নায়ুবিক অস্থিরতা, মানসিক বিক্ষিপ্ততা, আত্মিক ও দৈহিক ব্যাধি এবং সংক্রামক ঘা-জখম, সমকামিতা, মানসিক বিকারগ্রস্ততা, এমনকি আত্মহত্যার মতো অশুভ প্রবণতা সেই ভোগাসক্ত ও বিলাসপ্রিয় সমাজ-সভ্যতায় মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে অভিনয়, সিনেমা ও মঞ্চনাটকের মাঝে এমন বর্বর কর্মকাণ্ডের চিত্রগুলো প্রকাশিত হয়। যৌনবাহিত রোগের সংক্রমণ, যেমন, গনোরিয়া, সিফিলিসের মতো রোগের প্রাদুর্ভাব এক আমেরিকায় কী পরিমাণ হয়েছিল তার একটি ছোট্ট পরিসংখ্যান দেখুন। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার তথ্যমতে যৌনবাহী রোগের উপসর্গ সব রোগের চেয়ে বেশি চিহ্নিত করা গিয়েছে। এর একটি পরিসংখ্যান দেখে তা বুঝবেন। আজ ৯০% আমেরিকান যুবক গনোরিয়ার মতো যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত। ৬০% এর মতো যুবক সিফিলিসের মতো যৌনবাহিত রোগে সংক্রমিত। ৪০% এর মতো যুবক যৌন- অক্ষমতার শিকার। বছরে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশহাজার উঠতি বয়সী তরুণ বংশানুক্রমিক গনোরিয়ার মতো যৌনবাহিত রোগের সংক্রমণে মারা যায়।'২৩১

যার কারণে দেখা যায়, যুবকদের বিরাট একটি অংশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার মতো যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই রোগের কারণে এক ফ্রান্সই সত্তরহাজার যুবককে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে আমেরিকার ছয় মিলিয়নের মাঝে এক মিলিয়ন লোকই সামরিক বাহিনীর জন্য অনুপযোগী।'২৩২ এই রোগের কারণে মেধা নষ্ট হতে থাকে, ধৈর্য-সহ্যের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনকি তারা প্রজনন ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে।

ধ্বংস ও বিপর্যয়ের ব্যাপক ভয় এই অস্থির বিশ্বকে আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে। ভয়াবহ যুদ্ধের অপচ্ছায়া পৃথিবীর তাবৎ মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের ক্লান্তি-অবসাদ দূর করার বিছানাগুলো কেটে কেটে সুখ- আনন্দের ঢেউগুলো স্তিমিত করে দিয়েছে। পশ্চাৎপদতা এবং বিলুপ্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছে কিছু কিছু জনগোষ্ঠী। যেমন ধরুন,

এক ফ্রান্সেই সেখানকার ৪২ মিলিয়ন অধিবাসীর মাঝে ৩৩ মিলিয়নই নিজেদের ভিটেমাটি ও মূল বাসভূমি ছেড়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তারপর বিদ্রোহীদের বিভিন্ন সভা- সমাবেশ শুরু হলো, উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবসভ্যতা যে অস্থিরতা এবং দুঃখ-যন্ত্রণার শিকার হচ্ছে তার প্রতিবাদ করা। এসব সভা-সমাবেশের একটি অংশ হলো সমাজবিরোধীদের সমাবেশ। তারা আমেরিকা-ইউরোপের ওপর বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে এবং আমেরিকা ও পশ্চিমাদের নিরাপত্তার জন্য এক চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা মিলিয়ন মিলিয়ন লোকের নতুন এক সমাজ ও কমিউনিটি গড়ে তুলছে। বিভিন্ন সমাজ ও স্তরের লোকজন এক জায়গায়—বিভিন্ন সড়ক ও রাস্তাঘাটের মাঝখানে—এসে জড়ো হয়েছে। এদের খাবারদাবার, মলত্যাগ, বিয়ে-শাদি সবই এক জায়গায় চলছে—বিভিন্ন সড়ক ও রাস্তা-ঘাটের মাঝখানে। চলুন, আপনাদের সামনে শহিদ সাইয়িদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর কিছু অভিব্যক্তি—তাঁর ‘খাসায়িসুত তাসাওয়ুর আলইসলামি গ্রন্থ থেকে—তুলে ধরি। এটি সাইয়িদের অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনাগুলোর একটি।

তিনি বলেন, 'কোনো জ্ঞানবান বিবেচনাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি—যাকে এখনো ওইসব কলুষতা স্পর্শ করতে পারেনি, যা আজকের মানুষের মধ্যে জেঁকে বসেছে—যখন এই পশ্চাৎপদ অবনতিশীল মানবতা এবং অসার ও অন্তঃসারশূন্য বিশ্বব্যবস্থার দিকে তাকাবে, তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই বিশ্বসভ্যতার প্রতিটি দিক ও বিভাগ কতটা কলুষ হয়ে গেছে। এর আইন-শৃঙ্খলা ও নীতি- ব্যবস্থপনাগুলো কতটা অকেজো ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। কতটা নড়বড়ে হয়ে উঠেছে এর অবকাঠামো। প্রথা-সংস্কৃতি, স্বভাব-চরিত্র, নৈতিকতা-রুচিবোধ এবং চলাফেরা ও কর্মতৎপরতা কতটা অসার, নীতিবিরুদ্ধ ও ঝামেলাময় হয়ে গেছে। সে দেখতে পাবে, এই বিশ্বব্যবস্থা উন্মাদের মতো নিজের দেহাবরণ ও পোশাক- পরিচ্ছদ কীভাবে ছুড়ে ফেলেছে। কতটা সংকুচিত হয়ে পড়েছে এই বিশ্বসভ্যতার কর্মতৎপরতা। সে বুঝতে পারবে বিশুদ্ধ চিন্তা-

---

২৩১. দেখুন, সাইয়িদ মাওদুদির ‘কিতাবুল হিজাব’।

২৩২. ১৯৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছিল, ‘আমেরিকান তরুণরা আজ আর সৈনিক হবার উপযুক্ত নয়, তারা তো পুরোপুরি যৌন-উন্মত্ততায় মেতে উঠেছে। ফলে তারা শারিরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।' (লেখক)

চেতনার চিত্রগুলো কতটা দ্রুত গতিতে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাসের ভিতগুলো কতটা নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে—যত দ্রুত গতিতে ফ্যাশন হাউসের ড্রেসগুলো পরিবর্তন হতে থাকে।

সে দেখতে পাবে এই বিশ্বসমাজ দুঃখ-বেদনায় কোঁকড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আবার ধাওয়া খাওয়া জন্তুজানোয়ারের মতো উন্মত্ত ছুটে চলেছে। এমনকি ভারসাম্যহীন লোকের মতো হাস্যরসে মেতে আছে, মাতালের মতো আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে অশালীনতায়, অসার ও অনর্থক বিষয় নিয়ে মাতামাতি করছে, ছুটে চলেছে অলীক স্বপ্ন ও মিথ্যা কল্পনার পেছনে। নিজেদের মূল্যবান উপাদান ছুড়ে ফেলে হাতে লেপটে থাকা ময়লা-আবর্জনা বা বালুকণার মতো খুব নোংরা ও সস্তা বস্তু সঞ্চয়ে মেতে উঠেছে। অভিশাপ এদের ওপর, যেভাবে এরা পৃথিবীর অলীক স্বপ্ন আর অসার কল্পনার কথা ফেরি করে, যেভাবে এরা এই নীতিহীন ভ্রষ্ট সভ্যতার কীর্তন করে! এসব অলীক কল্পনা আর গালগল্পই তো মানুষকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এসব অন্তঃসারশূন্য তত্ত্বই মানবসভ্যতাকে এমন এক যন্ত্রের সামনে নিয়ে গেছে যা মানবিক মূল্যবোধের ওপর মোহর এঁটে দেয়।

তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক সুখ, সৌন্দর্য- পরিশীলিত অনুভূতি, আবেগ-উচ্ছ্বাস, বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পরিশীলিত গুণগুলো নিঃশেষ করে দিচ্ছে। আর এ সবকিছুই করা হয়েছে গুটি কয়েক সুদখোর পুঁজিপতি, পাপ-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত প্রমোদব্যবসায়ী, ফিল্মমেকার, বিভিন্ন ফ্যাশন-শোর মালিক ও বিনিয়োগকারীদের মুনাফার জন্য। আপনারা মানুষগুলোর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, পোশাক, আকার-আকৃতি, চাল-চলন, চিন্তা-চেতনা, অভিমত ও আহ্বানগুলো ভালো করে খেয়াল করুন। আপনার কাছে মনে হবে তারা সবাই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা তাড়িত ও বিতাড়িত হচ্ছে। কোনো কিছুর ওপরই স্থির থাকতে পারছে না এবং কোনো কিছুই মজবুত করে আঁকড়ে ধরতে পারছে না। তারা বাস্তবেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা ছটফটে অস্থির, নিরানন্দ; অন্তরাত্মা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের ভেতরটা কোনো জায়গাতেই প্রশান্তি পাচ্ছে না। তাদের আত্মা কোনো মজবুত অক্ষ-বৃত্তকে ঘিরে আবর্তন করতে পারছে না।

আর এই অসহায় দুর্ভাগা মানবসভ্যতাকে ঘিরেই একদল সুবিধাভোগী গজিয়ে উঠেছে। তারা মানুষের এই অস্থিরতা, অস্থিতি এবং উদ্ভ্রান্তির পরিবেশকে লুফে নিয়েছে। অন্যদিকে এই দুর্বলতা আর বিক্ষিপ্ততাকে পুঁজি করে মাটিফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে কিছু সুদি বিনিয়োগকারী, চলচ্চিত্র নির্মাতা, ফ্যাশন-শো উদ্যোক্তা, বাণিজ্যিক সাংবাদিক ও লেখকের দল। যখন বিশ্বসভ্যতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার স্বাভাবিকতা ও উচ্ছল কর্মতৎপরতা নিশ্চল হয়ে পড়েছে, অবশেষে যখন নিজের মূল কেন্দ্র ও স্বাভাবিক অক্ষ-বৃত্তে ফিরে আসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বা সব জটিলতা কাটিয়ে নীড়ে ফিরে আসার সংগ্রাম করছে, তখন এই বিকারগ্রস্ত স্বার্থান্বেষী আর

নিয়ন্ত্রক মহলটি এই মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে নতুন নতুন বিপর্যয় আর দুর্যোগের কলকাঠি নাড়ছে। আরেক গোষ্ঠী আছে যারা সবসময় উন্নতি-অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, এবং সংস্কার ও সংযোজন-বিয়োজনের ডাক দিতেই থাকে। কিন্তু তাদের কাছে এই উন্নয়ন-অগ্রগতির কোনো সঠিক পরিকল্পনা নেই। নেই কোনো বিশুদ্ধ নিয়ম-নীতি। কোনো মজবুত অবকাঠামো বা সুনির্ধারিত কোনো পরিসীমাও নেই। আসল কথা হলো, গোটা মানবসভ্যতার জন্যে এ সবগুলোই বিপজ্জনক। এমনকি তা বিশ্বসভ্যতার ওপর তাদের ষড়যন্ত্র বিস্তারের ঘৃণ্য পদক্ষেপ, এই জগতকে অস্থির ও অস্থিতিশীল করার জঘন্য তৎপরতা। আর এটি অনাগত ভবিষ্যতের জন্যেও অশনি সংকেত।'[২৩৩]

একটি বিপরীতমুখী দৃশ্য

চলুন, এবার আপনাদের একটি বিপরীতমুখী দৃশ্য দেখাই। আমরা এমন একটি ইসলামি চরিত্রের কথা বলি, যাকে বিনির্মাণ করেছে ইসলামের আকিদাহ-বিশ্বাস। আপনারা দেখতে পাবেন, এই পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো কতটা আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়প্রশান্ত; কতটা আত্মপ্রশান্ত ও চক্ষু শীতলকারী স্বভাবের। তাদের মাঝে কোনো অস্থিরতা নেই, নেই কোনো অস্বস্তিবোধ। ভয়ানক কোনো পেরেশানি বা ধ্বংসাত্মক কোনো চিত্ত-অস্থিরতাও নেই। এমনকি তাদের একেকজনের অভিব্যক্তি হয় এমন—আমরা যে সৌভাগ্যে আছি, যদি রাজা-বাদশাহ আর আমির-উমারারা বুঝত, তাহলে এই আত্মপ্রশান্তি ছিনিয়ে নিতে তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো'[২৩৪]

বিখ্যাত মনীষী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'বাদশাহ কাদের বলা হয়?' তিনি বললেন, 'দুনিয়াবিরাগী মানুষগুলোই বাদশাহ।' আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'দুনিয়াসক্ত কারা?' তিনি বললেন, ওইসব লোক দুনিয়াসক্ত ও ঘৃণ্য বলে পরিচিত যারা নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে খায়।' তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইতরের চেয়ে আরও নীচ স্তরের কারা?' তিনি বললেন, "যারা অন্যের দুনিয়ার জন্যে নিজেদের আখিরাত বরবাদ করে।'[২৩৫]

---

২৩৩. খাসায়িসুত তাসাওয়ুর আলইসলামি, পৃষ্ঠা : ৯১

২৩৪. এটি ইবরাহিম ইবনু আদহাম রহিমাহুল্লার একটি প্রসিদ্ধ উক্তি। ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আযযুহদুল কাবির' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (পৃষ্ঠা : ৮১)। (অনুবাদক)

২৩৫. সিফাতুস সাফওয়াহ, ৪/১৩৯

আপনি রাবিয়াহ আদাবিয়ার নিচের কবিতায় আরও স্বাদ অনুভব করতে পারবেন,

এই দুনিয়া যতই তিক্ত হোক,

যদি তুমি থাকতে মিষ্ট-অম্লমধুর

গোটা জগৎ গোস্বাতে ফেটে পড়ুক,

যদি তুমি হতে তুষ্ট, আমার বীণার সুর!

আমার মাঝে, জগত জুড়ে হোক না নাদ আর বিষাদ,

যদি তোমার সাথে থাকে প্রীতি আর বন্ধন।

সত্য যদি হয় প্রেমার্ঘ্য তোমার,

তবে যে সব বিষাদ হবে ভ্রান্ত।

মাটির পরে বিচরণ করে যারাই,

তারা তো ফেরে মাটিতেই অবশেষে।

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমনই চমৎকার একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন,

« عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

'মুমিনদের অবস্থা বড় বিস্ময়ের। তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি বিষয় এবং প্রতিটি মুহূর্তই কল্যাণকর। এ বিষয়টি মুমিন ছাড়া কারও ব্যাপারে কল্পনাই করা যায় না। তার যদি কোনো খুশির ব্যাপার আসে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে; তাই এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি কোনো বিপদ আসে, সে সবর করে; এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।'[২৩৬]

যে মুসলিমের হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে আকিদাহ গেঁথে গেছে, সে দুনিয়ার কোনো উপসর্গে ভীত হয় না, কোনো বিপদ ও দুর্যোগে অস্থির হয়ে ওঠে না। দুনিয়ার কোনো প্রতিকূলতা কোনো মুসলিমকে অস্থির ও উদ্ভ্রান্ত করে তুলতে পারে না। কারণ, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। এই মহাজগৎ তাঁরই তুচ্ছ সৃষ্টি। আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা।'[২৩৭]

---

২৩৬. সহিহ মুসলিম : ৭৬৯২

২৩৭. সুরা রাদ, ১৩ : ১৬; সুরা যুমার, ৩৯ : ৬২

সে ভালো করেই জানে মানুষ হলো একমুষ্টি মাটি, ফুঁকে দেয়া একটি রুহ মাত্র। বিশ্বজগতের রব তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তার অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল জান্নাত থেকে, চলতে চলতে পৃথিবীতে এসে সামান্য সময়ের জন্য অবতরণ করেছে সে। কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয় তারআরেক নতুন অভিযাত্রা; একটি দৃঢ় ও বক্রতামুক্ত পথ দিয়ে আবার সে পৌঁছে যাবে তার সেই অনিন্দ্য সুন্দর প্রথম ঘরে, পবিত্র জান্নাতে।

فحيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّها - مَنازِلَنا الأولى وفيها المُخَيَّمُ

ولَكنَّنا سَبي اللعدُةِ فَهَل تَرَى نعو إلى أوطاننا وَنُسلِمُ

'চলো জান্নাতু আদনে, ওটাই তোমার প্রথম মানযিল— অপূর্ব সব ছাউনি আর পর্দাবৃত বাড়ি!

কিন্তু আমরা যে বন্দি শত্রুতে, দেশে নিরাপদে ফিরতে পারব কি?'২৩৮

এই তো সরল পথ—সিরাতুল মুসতাকিম। কুরআন ও সুন্নাহর একান্ত অনুসরণই হলো এর সারকথা। আর এ পথে একটি ভয়ংকর শত্রুও আছে, জান্নাতের পথ থেকে বের করে দেয়ার জন্যে সে ঘাঁপটি মেরে আছে। দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা যেসব প্রশ্নে উদভ্রান্ত হয়েছিল, তার সবই রব তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলিমদের এমন সত্য ও নির্ভরযোগ্য উৎস পাঠিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন, যেখানে তার সব প্রশ্ন, অভিযোগ আর সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দেয়া আছে, সমাধান দেয়া আছে; যা সব দোদুল্যমানতা দূর করে দেয়। বান্দাকে দৃঢ়বিশ্বাসী করে তোলে। সেই দৃঢ়বিশ্বাসী মুসলিম জানে এই দুনিয়াই শেষ নয়, এই বস্তুজগৎই চূড়ান্ত নয়। আর কর্মের সব ফলাফলও এই দুনিয়াতে দেয়া হয় না।

وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩) وَأَنَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يُرَىٰ (٤٠) ثُمَّ يُجۡزَىٰهُ ٱلۡجَزَآءَ ٱلۡأَوۡفَىٰ (٤١)

'মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে। তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। এরপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।'২৩৯

একজন মুসলিমের বিশ্বাস, দুনিয়াতে যা কিছু সে হারিয়েছে বা যা সঞ্চয় করতে পারেনি, আখিরাতে এর বদলা সে পাবে। আখিরাতের প্রশস্ত জিন্দেগির তুলনায় দুনিয়ার ছোট্ট হায়াত যেন দিনের সামান্য সময়ের মতো।

২৩৮.হাদিয়ুল আরওয়াহ,পৃষ্ঠা :১৯৬; মাদারিজুস ২৩৯ সালিকিন, ১/১২৩

২৩৯. সুরা নাজম, ৫৩:৩৯-৪১

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيل

'আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ তো খুবই সামান্য।'২৪০

এভাবেই তাদের এই বিশ্বাস তাদের হৃদয়কে আত্মপ্রশান্তিতে ভরপুর করে দেয়। হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে সৌভাগ্যের স্বাদ-অনুভূতি সঞ্চারিত করে। এই চিন্তা- বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ জীবনদর্শনই একজন মুসলিমকে ছোটোখাটো সমস্যাগুলো এড়িয়ে চলতে শেখায়, তাকে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন করে তোলে। অনর্থক কথা আর গুরুত্বহীন কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে রাখার তালিম দেয়, গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি তার দিল-দেমাগকে নিবদ্ধ করে। কিন্তু এসব পূণ্যময় কাজের গুরুত্ব ও মহত্ব আরও বেড়ে যায়, যখন এর সাথে আত্মত্যাগ ও জানমালের কুরবানি যুক্ত হয়। অবশেষে সে জান্নাতের প্রত্যাশায়—যা নিজ জান ও সারা দুনিয়ার চেয়েও মহামূল্যবান— আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে নিজ আত্মাটাও বিলিয়ে দেয়।

আপনারা আমার সাথে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক রোমসম্রাটের কাছে পাঠানো চিঠির কথা স্মরণ করুন। তিনি রোমসম্রাটের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এমন এক জাতি নিয়ে এসেছি, যারা মৃত্যুকে এতটাই ভালোবাসে, তোমরা জীবনকে যতটা ভালোবাসো।'২৪১

ইসলামের এই মহাজাগতিক তারবিয়াহ বনু আবদিদ দারের এক নারীকে এ কথা বলার মতো সেই শক্তি-সাহস তাঁর ভেতর সঞ্চালিত করেছিল, যখন তাঁকে তাঁর স্বামী, ভাই ও বাবার শহিদ হবার সংবাদ দেয়া হয়—এমন মর্মান্তিক খবর শুনেও—তিনি বলেছিলেন, 'আমার নবির কী খবর?' লোকেরা বলল, "তিনি ভালো ও সুস্থ আছেন।' তখন তিনি বললেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সুস্থ থাকেন, তবে তো এসব দুঃসংবাদ একেবারেই তুচ্ছ।'২৪২

এই আকিদাহই সমকালীন ইসলামি লেখক মরহুম সাইয়িদ কুতুবের বোন আমিনাহ কুতুবের মতো নারীকে মহিয়সী করে গড়ে তুলেছিল। বড় বড় আমির তাঁকে বিয়ের জন্য 'খিতবাহ' বা বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। রাষ্ট্রদূতও বিয়ের পয়গাম দিয়েছিল, কিন্তু তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশেষে ১৯৬৩ সালে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এক

---

২৪০. সুরা তাওবাহ, ৯ : ৩৮

২৪১. তারিখ ইবনি খালদুন, ১১/৮১

২৪২. দালায়িলুন নবুওয়াহ, বর্ণনা নং ১১৯৩; আলবিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ, ১৭/১৪৬

আসামী কামাল আসসানানিরিকে নিজেই বিয়ের পয়গাম পাঠান। কিন্তু এর জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় দশ-দশটি বছর। আমার জানামতে এটিই ছিল ইতিহাসের দীর্ঘতম ‘খিতবাহ’। ১৯৭৩ সালে যখন পরম কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি শেলের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসেন, আমিনাহ কুতুব তাঁকে বিয়ে করেন। একজন মুসলিমের আত্মা প্রশান্ত থাকে। কারণ, সে বিশ্বাস করে রিযিক নির্ধারিত এবং মৃত্যুও ঠিক সময়েই আসে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَلًا

‘আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না, সেজন্য একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে।’২৪৩

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

‘আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।’২৪৪

একজন মুসলিমের এই নিশ্চয়তা থাকে যে, এই বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুই নির্ধারিত। প্রতিটি ঘটনার পেছনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালারই শক্তি কাজ করে এবং প্রতিটি জীবন ও প্রাণবন্ত বস্তুর ওপর তাঁরই কর্তৃত্ব কার্যকর হয়। তিনি যা চান, তা-ই করেন।’২৪৫ তিনি সবকিছুর ওপর বিজয়ী।’২৪৬ তাঁর বিধান উৎখাত করার অধিকার কারও নেই।’২৪৭ সবকিছু তাঁর কছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।’২৪৮ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সব খাযানা তাঁরই অধীনে।’২৪৯ তিনি যাকে চান ইজ্জত দেন, যাকে চান যিল্লতি করেন।’২৫০

এই দৃঢ় বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ চিন্তাদর্শন ব্যক্তিকে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ও অভিজাত করে তোলে।

---

২৪৩. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪৫

২৪৪. সুরা যারিয়াত, ৫১ : ২২

২৪৫. সুরা হুদ, ১১ : ১০৭, সুরা বুরুজ, ৮৫ : ১৬

২৪৬. সুরা ইউসুফ, ১২ : ২১

২৪৭. সুরা রাদ, ১৩ : ৪১

২৪৮. সুরা হুদ, ১১ : ১২৩

২৪৯. সুরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৭

২৫০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ২৬

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

'যে সম্মান চায় (সে জেনে রাখুক), সমস্ত সম্মান আল্লাহরই মালিকানায়।'২৫১

এই আকিদাহই ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহর মতো মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে। যিনি সেই যুগের শাসকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। তারা তাঁকে দুর্গের বন্দিশালায় বেঁধে রেখেছিল। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে কতটুকুই বা দমিয়ে রাখবে? যদি আমাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তো আমি শহিদ হবো। যদি জেলে আটকে রাখো, তাহলে এটি হবে আমার রবের সাথে নির্জনে সময় কাটানোর সুযোগ। আর যদি আমাকে দেশান্তর করো, তা হবে আমার রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা।'২৫২

প্রতিটি যুগে, প্রতিটি শতাব্দীতে এই আকিদাহর ছায়ায় অসংখ্য মহৎ মানুষের আগমন ঘটেছে। চলুন, আমরা কালের পর্দা উঠিয়ে দেশ ও অঞ্চলের দূরত্ব ডিঙিয়ে ইমাম ইয ইবনু আবদিস সালামের বজ্রকণ্ঠ শুনে নিই। সৎ বাদশাহ ইসমাইলের পত্রবাহক এসে ইয ইবনু আবদিস সালামের কাছে এই প্রস্তাব করল যে, 'আপনি নিজ ভুলের জন্য বাদশাহর কাছে ওজরখাহি করবেন এবং খোশদিলে বাদশাহর হাতে চুমু খাবেন, যেন বাদশাহ আপনাকে কাযির পদে পুনর্বহাল করেন।' তখন তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বললেন,

'আল্লাহর কসম করে বলছি, স্বয়ং বাদশাহ এসেও যদি আমার হাতে চুমু খায় তবুও আমি তার হাতে চুমু খাব না। হে বাদশাহর গোলামেরা, তোমরা এক দুনিয়ায় থাকো আর আমরা থাকি আরেক দুনিয়ায়। প্রশংসা সুমহান আল্লাহর, যিনি আমাকে ওই যিল্লতি থেকে মুক্ত রেখেছেন, যার মাঝে তোমাদের আকণ্ঠ নিমজ্জিত রেখেছেন।'২৫৩

বর্তমান সময়ে ওইসব মহৎ ব্যক্তির অন্যতম হলেন উস্তায সাইয়িদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ। শেলের অভ্যন্তরে তাঁকে বহু পদ-পদবির প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, অনেক ধন-সম্পদের লোভ দেখানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি শেলের ভেতরে নিজেকে পাথরের খুঁটিতে বেঁধে রাখাকেই বেছে নিয়েছিলেন। এই চকচকে কপট পদ আর প্রাচুর্য তিনি গ্রহণ করেননি, প্রবেশ করেননি এই মিথ্যা মরীচিকার জগতে।

---

২৫১. সুরা ফাতির, ৩৫ : ১০

২৫২. আলওয়াবিলুস সাইয়িব, পৃষ্ঠা : ৫৭

২৫৩. সুয়ুতি, হুসনুল মুহাদারা, ১/৪৭৬

তিনি বলতেন, 'যে আঙুল সালাতে আল্লাহর তাওহিদের সাক্ষ্য দেয়, তা দিয়ে তাগুতের পক্ষে যায় এমন একটি বর্ণও আমি লিখতে পারব না।'

তিনি আরও বলতেন, 'কেন আমি করুণা চাইব? কেন আমি দয়া ভিক্ষা করব? আমি যদি হকের পক্ষে থেকে অপরাধী হই, তাহলে এই অপরাধ আমি মাথা পেতে নেব। আর যদি আমি বাতিলের পক্ষে থেকে অপরাধী হই, তাহলে আমি আরেক বাতিলের কাছে মাথা নত করতে প্রস্তুত নই। আর আমি তাদের কাছে করুণাভিক্ষা চাওয়া থেকেও অনেক ঊর্ধ্বে।'[২৫৪]

এই মহান আকিদাহই সুদানের বিখ্যাত মন্ত্রী মুহাম্মাদ সালিহ উমারকে এ দুনিয়া দুপায়ে মাড়িয়ে যাযাবর আর তাঁবুর দুনিয়া বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ফিলিস্তিনের টিলায় টিলায়, পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় মুজাহিদবেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অবশেষে 'আবা' উপত্যকায় শহিদবেশে মহান রবের কাছে ফিরে যান।

---

২৫৪. বাসসাম, উলামা ওয়া উমারা, পৃষ্ঠা : ৯৬

নবম অধ্যায়

কীর্তিমানের কীর্তিগাঁথা

এখন আমরা ওইসব কীর্তিমানের আলোচনা করব, বিশুদ্ধ আকিদাহ-বিশ্বাসই যাদের বিনির্মাণ করেছিল। ইসলামের এই মহান আকিদাহ এমনসব মহামনীষীর জন্ম দিয়েছিল, যাদের কৃতিত্ব ও জীবন-ইতিহাস শুনলে মানুষ মনে করবে, এগুলো তো কাল্পনিক গল্প আর প্রাগৈতিহাসিক উপাখ্যান মাত্র। অথচ এগুলো পরম বাস্তবতা। এমন বাস্তবতা, কল্পনাও যেখানে পৌঁছুতে পারে না। তাঁরা সত্যের পথে জীবন কাটিয়েছিলেন, সত্যকে আঁকড়ে ধরেই যিন্দেগি পার করেছিলেন। যত ত্যাগ ও কুরবানির প্রয়োজন পড়ুক না কেন, তারা সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চলুন, আপনাদের সামনে তাঁদের মহৎ জীবনের কিছু অসাধারণ দৃশ্য তুলে ধরি।

প্রথম ঘটনা

সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব রহিমাহুল্লাহ, উচ্চস্তরের তাবিয়ি ছিলেন। কোনো যুবরাজ বা সম্ভাবনাময় কোনো ব্যক্তির জন্য 'অগ্রিম' বাইয়াহ'[২৫৫] দেয়ার ব্যাপারে তাঁর ভিন্নমত ছিল। খলিফাহ থাকাকালীন অন্য কারও জন্য বাইয়াহ দেয়াকে তিনি বৈধ মনে করতেন না। হাদিসের বুঝ থেকেই তিনি তা বলতেন। এটিই তাঁর কাছে বিশুদ্ধ মনে হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, এটিই হাদিসের উদ্দেশ্য ও সঠিক বুঝ। এ জন্য শাসক-প্রশাসকরা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের যুলুম-নির্যাতন করেছিল।

তবুও তিনি আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সময় পর্যন্ত নিজের মত ও পথের ওপর অটল ও অবিচল ছিলেন। আবদুল মালিক নিজ পুত্র ওয়ালিদের জন্য আগ থেকেই বাইয়াতটা নিয়ে রাখতে চেয়েছিল। সে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে চিঠি লিখে মুসলিমদের বাইয়াহ-প্রদানের নির্দেশ দেয়। ইয়াহইয়া ইবনু সায়িদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, মদিনার গভর্নর হিশাম ইবনু ইসমায়িল আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে পত্র লিখে জানায় যে, গোটা মদিনাবাসী ওয়ালিদ ও সুলাইমানের জন্য বাইয়াহ দিতে রাজি, কেবল সায়িদ ইবনুল মুসাইয়ার ছাড়া।

---

২৫৫. আনুগত্যের শপথ (অনুবাদক)

আবদুল মালিক চিঠি লিখে গভর্নরকে নির্দেশ দিলো, সায়িদ ইবনুল মুসাইয়াবকে তরবারির ভয় দেখাও। যদি তাতেও না দমে, তাহলে চাবুক মেরে মদিনার গলিতে গলিতে, বাজারে বাজারে ঘোরাও।

আবদুল মালিকের চিঠি গভর্নরের কাছে পৌঁছার পরপরই সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িবের কাছে সুলাইমান ইবনু ইয়াসার, উরওয়াহ ইবনু যুবাইর ও সালিম ইবনু আবদিল্লাহ আসলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার কাছে একটি ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছি। গভর্নরের কাছে আবদুল মালিকের নির্দেশ এসেছে যে, আপনি যদি বাইয়াহ না দেন, তাহলে আপনার গর্দান কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা আপনার সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করব। আপনার জন্যে যেকোনো একটি বেছে নেবার সুযোগ থাকবে। গভর্নর আপনার ব্যাপারে এতটুকু ছাড় দিতে রাযি হয়েছে যে, সে আপনার সামনে খলিফাহর বাইয়াতনামা পড়ে শোনাবে, কিন্তু আপনি হাঁ-না কিছুই বলবেন না।'

তিনি জবাব দিলেন, 'তাহলে তো মানুষ বলবে, সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব বাইয়াহ দিয়ে দিয়েছে। আমি তা করতে পারব না।' কারণ, তিনি যদি 'না' বলে দেন বা বাইয়াহ দিতে অস্বীকার করেন তাহলে তো তারা 'হাঁ' বলে প্রচার করতে পারবে না যে তিনি বাইয়াহ দিয়েছেন। তখন আগন্তুক তিনজন বললেন, তাহলে আপনি কিছুদিন ঘরে অবস্থান করুন, ঘর থেকে বেরোবেন না, কিছুদিন মসজিদে না গিয়ে বাসায়ই সালাত আদায় করুন। কারণ, গভর্নর আপনার কছ থেকে এই ওজরও কবুল করবে যে, সে আপনাকে দরবারে ডেকে পাঠিয়েছে কিন্তু আপনাকে যথাস্থানে পাওয়া যায়নি।' তিনি জবাব দিলেন, 'হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ এই আওয়াজ আমার কান ভেদ করে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে আর আমি ঘরে বসে থাকব, এটি হতেই পারে না। আমি এমন কাজ করতে পারব না।'

আগন্তুক তিনজন আবার অনুরোধ জানালেন, 'সালাতশেষে আপনার মজলিস ছেড়ে উঠে যাবেন। যখন গভর্নর লোক পাঠিয়ে দেখবে আপনি সেই মজলিসে নেই, তাহলে সে আর আপনার পিছু নেবে না। তিনি জবাব দিলেন, 'মানুষের ভয়ে আমি এমনটি করব?'[২৫৬] তাঁর জবাব ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, সবাইকে নিশ্চুপ করে দেয়ার মতো। সত্যের প্রতি তাঁর অবিচলতা ও দৃঢ়পদতার রহস্য এই জবাবের মাঝ দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় ঘটনা

ঘটনাটি ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর। কুফায় একটি ছাগল হারিয়ে যায়, ছাগলটির মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার আগপর্যন্ত তিনি সব ছাগলের মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাত বছর তিনি

এভাবে পরহেয করে করে চলেছেন।'[২৫৭] একটি ছাগল স্বাভাবিকভাবে কত বছর বাঁচতে পারে, তা তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে জবাব দেয়া হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবে একটি ছাগল সাতবছর বাঁচতে পারে। ছাগলটির সাতবছর বেঁচে থাকার আশঙ্কা ছিল, যার কারণে মাংস তখনো হয়তো হারাম থেকে যাবে। তাঁর শঙ্কা তিনি যদি সেই মাংস খান তবে অন্তর থেকে আসমানি নুর নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। আর এটি হারাম বস্তুর কুপ্রভাব, অন্তর থেকে নুরের আভা চলে যায়। যদিও মূল বস্তু না জেনে হারাম খেলে গুনাহ হবে না, কিন্তু দিলের সেই নুর, অন্তরের সেই নির্মল আলো তো ঠিকই হারিয়ে যাবে।

তৃতীয় ঘটনা

ইমামুল হারামাইন মুহাম্মাদ আলজুওয়াইনি রহিমাহুল্লাহর বাবার ঘটনা। ইমামুল হারামাইনের জীবনীতে আছে, তাঁর বাবা প্রথম জীবনে মজুরির বিনিময়ে কাপড় বুনে দিতেন। এভাবে পরিশ্রমের টাকা জমতে জমতে বেশকিছু টাকার সঞ্চয় হলো। টাকাগুলো দিয়ে তিনি ভালো, দক্ষ একটি বাঁদি কিনলেন। তিনি নিজ উপার্জনের টাকা থেকেই বাঁদিটির খাবার ও ভরণ-পোষণের খরচ চালাতেন। একদিন সেই বাঁদির গর্ভে ইমামুল হারামাইনের আগমন ঘটল। তাঁর বাবা হালাল উপার্জন থেকেই বাঁদিটির পরিচর্যা করে চলেছেন। তিনি ভূমিষ্ট হলে তাঁর বাবা বাঁদিকে অনুরোধ করলেন, সে যেন শিশুটিকে কোনোভাবেই অন্য কোনো মহিলার বুকের দুধ পান না করায়। একদিন তাঁর বাবা বাঁদির কামরায় প্রবেশ করে দেখলেন বাঁদিটি ব্যথায় কোঁকড়াচ্ছে, অন্যদিকে শিশু ইমামুল হারামাইনও কাঁদছেন। কারণ হলো, তাঁদেরই এক নারী প্রতিবেশী শিশু ইমামুল হারামাইনকে আদর করে কোলে নিয়েই দুধ খাওয়ানোর জন্য স্তন দুটো এগিয়ে দিয়েছিলেন, শিশু ইমামুল হারামাইনও সামান্য পান করে নিয়েছিল।

তাঁর বাবা এটি জেনে খুব ব্যথিত হলেন। শিশুটিকে কোলে নিয়ে মাথা উল্টো করে মদু ঝাঁকি দিলেন, পেটে হাত দিয়ে মালিশের মতো করে মৃদু চাপ দিতে লাগলেন, মুখের ভেতর আঙুল দিয়ে নাড়া দিতে লাগলেন। এমন করতে করতে এক পর্যায়ে শিশুটি পানকৃত পুরো দুধ বমি

---

২৫৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২/১৭১-১৭২

২৫৭. আলআয়িম্মাতুল আরবায়া, পৃষ্ঠা: ৬৫

করে বের করে দেয়। তিনি তখন বলছিলেন—মায়ের দুধ ছাড়া অন্য নারীর দুধ খেয়ে স্বভাবপ্রকৃতি নষ্ট হওয়ার চেয়ে বাচ্চাটি মরে যাওয়া আমার কাছে আরও সহজ। ইমামুল হারামাইন আলজুওয়াইনি যখন কোনো মুনাযারার মজলিসে বসতেন, যদি কোনো বিষয়ে হোঁচট খেতেন, তখন বলতেন—এটি সেই দুধপানের ফলাফল।'[২৫৮]

চতুর্থ ঘটনা

কাকা ইবনু হাকিম বলেন, 'আমি মাহদির মজলিসে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে সুফিয়ান সাওরিও এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি মাহদির রাজদরবারে আগমন করে মাহদিকে সাধারণভাবেই সালাম দিলেন। খলিফাহর সম্মানার্থে কুর্নিশ করেননি। তরবারিতে ঠেক লাগিয়ে খলিফার প্রহরী রাবি তাঁর মাথার কোণেই দাঁড়িয়ে ছিল, খলিফাহর নির্দেশের অপেক্ষা করছে শুধু। মাহদি সুফিয়ানের দিকে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে মুখে হাসির দ্যুতি ছড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'হে সুফিয়ান, আপনি এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে পালিয়ে বেড়ান। আর মনে মনে ভাবেন, আমরা চাইলেও আপনার কোনো অনিষ্ট করতে পারব না; অথচ আমি এখনো আপনার ওপর কর্তৃত্ব খাটাতে পারি। আপনি কি ভয় পান না যে, আমি আপনার ব্যাপারে যেকোনো লাঞ্ছনাকর নির্দেশ দিতে পারি?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আপনি যদি আমার বিরুদ্ধে অন্যায় কোনো হুকুম জারি করেন, তাহলে একক বাদশাহ মহাক্ষমতাধর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা—যিনি সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করেন—আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। তখন প্রহরী রাবি বলে উঠল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, কত বড় স্পর্ধা তার, সে আপনার সাথে এমন অভদ্রের মতো আচরণ করছে! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দিই।' মাহদি বলল, 'তোমার ধ্বংস হোক, চুপ করো। তোমার মতো অদূরদর্শী লোকেরাই চায় সুফিয়ানের মতো সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের হত্যা করে আমি দুর্ভাগা হই।' মাহদি নির্দেশ দিলো, 'কুফার সব কাযিদের ওপর সুফিয়ানের কর্তৃতনামা লিখে দাও, কেউ যেন তার বিচারকাজের ওপর ইশকাল না করে।' কর্তৃতনামা লিখে তাঁর কাছে দেয়া হলো, তিনি তা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এই কর্তৃত্বনামা তিনি দজলায় ছুড়ে ফেললেন।

---

২৫৮. মুনাবি, ফাইযুল কাদির, ৪৫২৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

এরপর তিনি অন্যত্র পালিয়ে গেলেন। সারা নগরী-জুড়ে তাঁর খোঁজ করা হলো, কোথাও পাওয়া গেল না।'২৫৯

সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ কুফার বিচার পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে গেলে কাযি শারিক আননাখয়ি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোনো এক কবি বলেন,

تَحَرِّزَ سُفْيَانُ وَفَرَّ بِدِينِهِ - وَأَمْسَى شَرِيكٌ مُرْصِدًا لِلدَّرَاهِمِ

'সুফিয়ান বিরত ছিল, দ্বীন বাঁচিয়ে পালিয়ে গেল, শারিক দিরহামের জন্য ওঁৎ পেতে রইল।'২৬০

পঞ্চম ঘটনা

ঘটনাটি সায়িদ আলহালাবির। ইবরাহিম পাশার সামনে সায়িদ হালাবির দৃঢ় অবস্থানের ঘটনা শুনে আমি ভীষণরকম আন্দোলিত হয়েছিলাম। ইবরাহিম পাশা একদিকে ছিল ধন-সম্পদ আর বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক, অন্যদিকে প্রচণ্ড দাপট আর ক্ষমতাধর প্রাদেশিক শাসক। যখন ইবরাহিম পাশা শাইখ হালাবির সাক্ষাতে মসজিদে প্রবেশ করে— তখনো শাইখ পা দুটো ছড়িয়ে বসেছিলেন—শাইখের মাঝে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না। মানুষ তো দলে দলে সালাম জানিয়ে মুসাফাহা করতে লাগল। ইবরাহিম পাশা দীর্ঘক্ষণ শাইখ সায়িদ হালাবির সামনে বসে থাকল। শাইখ তখনো পা গুটিয়ে নেননি। যতই সময় গড়াচ্ছিল পাশা ততই উত্তেজিত হচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে ক্রোধে ফেটে যাচ্ছিল। পাশা একটি মুদ্রার থলে নিয়ে রক্ষীর কাছে দিয়ে বলল, 'এটি শাইখকে দিয়ে দেবে।' যখন শাইখ সায়িদ হালাবির বাড়িতে মুদ্রার থলেটা রাখা হলো, শাইখ রক্ষীকে বললেন, 'যাও, তোমার পাশাকে গিয়ে বলো, যে ব্যক্তি পা বিছিয়ে রাখতে পারে সে হাত পাততে জানে না।'২৬১

আমাদের এই চিরন্তন আকিদাহ যে সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, সেটি এত সুন্দর ও নির্মল ছিল যে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি নাগরিক নিজ সম্মান ও সম্ভ্রমের ব্যাপারে ছিল ভয়হীন, নিরাপদ। যেমন, ব্যভিচারের কথাই ধরুন। সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের একটি হলো ব্যভিচার। কোনো বিবাহিত পুরুষ এই ঘৃণ্য কাজে জড়িয়ে পড়লে পাথরের আঘাতে আঘাতে মৃত্যুশাস্তি ভোগ করে। কোনো শব্দ বা বাক্যব্যবহার দ্বারা মানহানি ও কষ্ট থেকে—মান-সম্মানে আঘাত

---

২৫৯. ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ২/৩৯০

২৬০. বাইহাকি, সুনানুল কুবরা, বর্ণনা নং ২০৭৩৫

করে অপবাদমূলক সামান্য শব্দও হোক না কেন—একজন মুসলিম নিরাপদ। যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো মুসলিমের সম্মানহানি করে তাহলে তাকে জনসম্মুখে আশি দোররা খেতে হবে। কোনো অন্যায় ও অপবাদমূলক শব্দ ব্যবহার করে তাকে কলঙ্কিত করা যাবে না।

একজন মুসলিম তার মালের ব্যাপারেও নিরাপদ ও ভয়হীন। কারণ, চুরি কবিরা গুনাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি চার দিনার সমপরিমাণ অর্থ বা অন্যান্য মাল বা পণ্য চুরি করবে তার হাত কেটে দেয়া হবে। এমনকি একজন মুসলিম নিজ মাল ও অর্থ- সম্পদ অন্যায় ও অবৈধ পথে নষ্ট করে ফেলা থেকেও নিরাপদ। সুদ হারাম করা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র গুদামজাত করে রাখাও অবৈধ। ধোঁকা- প্রতারণা এবং ভেজাল পণ্য গছিয়ে দেয়াও কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। আর জুয়া তো শয়তান-প্ররোচিত নাপাক খেলা। একজন মুসলিম নিজ জান-প্রাণের ব্যাপারেও নিরাপদ। দুনিয়ার যত শক্তিশালী হাতই হোক না কেন, সে যদি অন্যায়ভাবে কারও রক্ত প্রবাহিত করে—নিহতের পরিবার ও আত্মীয়রা হত্যাকারী থেকে যদি কিসাস নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে—তাহলে এর উপযুক্ত কিসাস নেয়া হবে।

এটিই সর্বসম্মত মাসয়ালা,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذن بالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص

'আমি তাদের প্রতি বিধিবদ্ধ করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং আঘাতের বিনিময়ে সমান আঘাত।'[২৬২]

এমনকি একজন মুসলিমের জান-প্রাণ, ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম সবকিছু শাসক ও প্রশাসকদের থেকেও নিরাপদ। কারণ, এ সমাজের হাকিম-মাহকুম, শাসক-শাসিত সবাই শরয়ি বিধানের অধীন। কেউই এর বাইরে গিয়ে নিজ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। ইসলামি সমাজ অভিপ্রেত সমাজ। এ সমাজের সব সদস্য একদেহ একপ্রাণের মতো। যদি এই শরীরের কোনো অঙ্গ জ্বরাক্রান্ত হয়, তো গোটা শরীরই এর প্রকোপ অনুভব করে, নির্ঘুম রাত কাটায়। একদিন এক অসহায় সাহায্যপ্রার্থী নারী 'আমুরিয়া' অঞ্চল থেকে সাহায্য চেয়ে আর্তচিৎকার করেছিল।

---

২৬১. আলি নাদাবি, রাব্বানিয়াহ লা রাহবানিয়াহ (মুকাদ্দিমাহ)

২৬২. সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৫

তখনই খলিফাহ সাহায্যের জন্য বাগদাদ থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে যান। এক মুসলিম নারীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা আর্তচিৎকারে গোটা সৈন্যবাহিনী অভিযানে নেমে পড়ে। ইসলামের এই সমাজটি এমন এক অসাধারণ সমাজ, যার ব্যাপারে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যে সমাজে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আছেন, সেখানে আমি কোনো বাড়তি অধিকার প্রয়োগ করতে যাবো, এটি আমার কাছে তরবারি দিয়ে বিনা অপরাধে নিজ গর্দান নিজেই আলাদা করে দেয়ার চেয়ে অনেক প্রিয়।'২৬৩

এটি এমন নির্মল সমাজ, ইমাম শাফিয়ি এই সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে বলেন, 'লোকেরা বলে—কী ব্যাপার, আহমাদ আপনার সাক্ষাতে আসে, আপনিও তার সাক্ষাতে যান?' আমি বললাম, "আরে মহৎ গুণাবলি তার আঙিনা ছেড়ে কোথাও যায় না। যদি তিনি আমার সাক্ষাতে আসেন তাহলে এটি তার অনুগ্রহ, বিনয় ও মহত্ব। আর যদি আমি তাঁর সাক্ষাতে যাই, তাহলে সেটি তাঁর বড়ত্ব, মহত্ব ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে। সুতরাং উভয় অবস্থায়ই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানুভবতা এবং বিনয়-বিনম্রতা তাঁরই।'২৬৪

আবার ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফিয়ি রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে বলেন, 'ইমাম শাফিয়ি হলেন সূর্যের মতো, যা দুনিয়ার জন্য অপরিহার্য। তিনি হলেন সুস্থতার মতো, যা দেহের জন্য অপরিহার্য। তোমরাই বলো, সূর্য আর সুস্থতার কোনো বিকল্প আছে কি?'২৬৫ তিনি আরও বলেন, 'আমি তিন-তিনটি বছর এমন কোনো রাত কাটাইনি, যে রাতে ইমাম শাফিয়ির জন্য দুয়া-ইসতিগফার করিনি।'২৬৬ ইমাম শাফিয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

النَّاسُ عِيَالُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفِقْهِ

'ফিকহের ব্যাপারে মানুষ ইমাম আবু হানিফাহর প্রতি মুহতাজ।'২৬৭

ইসলামি সমাজ একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ, যেখানে সমুদ্রফেনার মতো কোনো ময়লা নেই, যা এই সমাজের ওপর কলুষিত দাগ হয়ে ভেসে থাকতে পারে। এই সমাজে কোনো নোংরামি নেই, কোনো কদর্য পরিবেশ নেই। এমন কোনো জটিলতা ও নেই, যা এই সমাজের স্বচ্ছতা,

---

২৬৩ তারিখুল খুলাফা, ১/১০৪

২৬৪. গিয়াযুল আলবাব, ১/৪৩৯

২৬৫. ইবনুল জাওযি, সিফাতুস সাফওয়াহ, ২/২৫০

২৬৬. ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ৪/১৬৪

২৬৭. মিযযি, তাহযিবুল কামাল, ২৪/৩৭২

পরিচ্ছন্নতাকে কাদাযুক্ত করতে পারে। এটি মজবুত বিচারব্যবস্থা-সমৃদ্ধ এমন এক সমাজ, যেখানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে একটি প্রক্রিয়াধীন বিচারিক কার্যক্রম কোনোক্রমেই এক বছর পার হবার সুযোগ ছিল না। এর আগেই বিচারিক সব কার্যক্রম নিষ্পন্ন হতো।

এটি সুসংহত অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচুর্যশীল সমাজ। উমার বিন আবদুল আযিযের শাসনামলে ইয়াহইয়া ইবনু সায়িদ আফ্রিকা অঞ্চলের যাকাত সংগ্রহ করে দীর্ঘ একমাস যাবৎ ঘোষণাই দিতে থাকেন, যেন যাকাতের হকদাররা এসে নিজেদের প্রাপ্য নিয়ে যায়। কিন্তু কেউই এলো না। পরিশেষে খলিফাহ নির্দেশ দিলেন, এগুলো দিয়ে গোলাম-বাঁদি কিনে আযাদ করে দিতে। এটি পারস্পরিক মেলবন্ধন, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যে পূর্ণ একটি সমাজ, যেখানে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি নেই, সূক্ষ্ম কোনো ফাঁকফোকরও নেই। তাই এই সমাজের দেহাভ্যন্তরে অপরিচিত কোনো নতুন দেহাংশের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে না এবং বিশৃঙ্খলামূলক কোনো কর্মকাণ্ডও ঘটাতে পারে না। যেমন, কাব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে—তাঁর নাজুক সময়ে'[২৬৮] —গাসসানের বাদশাহ প্ররোচিত করতে থাকে। কুরআনুল কারিম তাঁর এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছে,

حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ

'...যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল; আর তারা বুঝতে পারল, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই... ।'[২৬৯]

এমন নাজুক সময়ে, যখন গোটা মদিনাবাসী তাকে বয়কট করে, তাঁর সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। সেই ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে এবং আমার সেই দুই সাথির সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দেন।'[২৭০]

---

২৬৮. আজ যাই কাল যাই করে করে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা কিরাম কাব ইবনু মালিক, হিলাল ইবনু উমাইয়াহ এবং মুরারাহ ইবনু রাবিয়া এই তিনজনের সাথে কথাবার্তাসহ যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আল্লাহ তাঁদের তাওবাহ কবুল হবার ব্যাপারে আয়াত নাযিল করার আগপর্যন্ত এ পরিস্থিতি চলতে থাকে।(অনুবাদক)

২৬৯. সুরা তাওবাহ, ৯ : ১১৮

২৭০. সহিহুল বুখারি : ৪৬৭৭

কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি মদিনার বাজার দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ শাম থেকে আগত এক ব্যবসায়ী আমার সামনে পড়ল। সে খাবার বিক্রি করছিল আর বলছিল—কেউ কি আছ যে আমাকে কাব ইবনু মালিকের সন্ধান দিতে পারবে? তখন লোকেরা ইশারা দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল।সে আমার কাছে এসে গাসসানের বাদশাহর একটি চিঠি ধরিয়ে দিলো। আমি লিপিকার ছিলাম। দেখলাম চিঠিতে লেখা আছে, 'হে কাব, শুনেছি তোমার সঙ্গী তোমার ওপর অন্যায় করেছে। আল্লাহ তো তোমাকে অপমান আর বঞ্চনায় পড়ে থাকতে বাধ্য করেননি। তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমার দুঃখ- কষ্ট মোচন করে দেবো, তোমার প্রতি সমবেদী হবো।' তিনি বলেন, 'আমার মনে হতে লাগল, এটিও আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা। তাই দ্রুত চিঠিটি আগুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে ফেললাম।'২৭১

এই ইসলামি সমাজব্যবস্থা সত্যিই বড় বিস্ময়কর। দেখুন, গাসসানের বাদশাহ পর্যন্ত একজন সমাজচ্যুত মুসলিমকে নিজ দলে ভেড়াতে পারেনি, অথচ তিনি তখন নিজ ভূমিতেই পরবাসীর মতো ছিলেন। পরম আপন মানুষগুলোই হয়ে গিয়েছিল চির অচেনার মতো। এটি এমন একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজব্যবস্থা, যার প্রতিটি সদস্যের হৃদয়াত্মা এক ও অভিন্ন। তারা তাদের মহান নেতার চারপাশে ঐক্যবদ্ধ থাকে। তারা তাদের নেতার দিকনির্দেশনায় চলাফেরা করে। তাদের মহান নেতার সামান্য দর্শনেই তাদের চোখেমুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। এই সমাজই কাব ইবনু মালিককে সমাজচ্যুত করেছিল, এমনকি তাঁর সাথে সালাম- কালামও বন্ধ করে দিয়েছিল। কেন তাঁরা এমনটি করেছিলেন? তাঁরা তাদের মহান নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামান্য একটি নিষেধবাক্য শুনেছিলেন মাত্র, তাই করেছিলেন।

আমিরুল মুমিনিনের প্রতি ইমাম আযম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর হৃদয়ে কী পরিমাণ আনুগত্য ছিল, অল্প শব্দে তাঁর কাছ থেকেই শুনি চলুন। খলিফাহ মানসুর ইমাম আবু হানিফাহর ফাতওয়াদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু সেই দিনগুলোর কোনো এক রাতে তাঁর এক মেয়ের আঙুলে ক্ষত হয়, তাই ওযুর মাঝে রক্তের কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা তা জানার জন্য খলিফাহর মেয়ে তাঁর কাছে আসে। তিনি বলেন, 'তুমি হাম্মাদকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। কারণ, আমাদের আমির আমার ফাতওয়াদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। আমি আমিরের অনুপস্থিতিতে তাঁর কোনো আদেশ অমান্য করতে পারব না।'

হে প্রজন্মের সন্তানেরা! মানুষের অন্তরাত্মা এবং নতুন সুসংহত সমাজ বিনির্মাণে আকিদাহ ও

---

২৭১. মুসনাদু আহমাদ : ১৫৮২৭

এর প্রভাব নিয়ে এটি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আমরা এই স্বল্প সময়ে আকিদাহর আরাকান বা ভিত্তিগুলো তুলে ধরেছি। আকিদাহয় যখন ঘুণ ধরবে, সমাজের প্রাণোৎসবে যখন এই বিকৃত দর্শনের প্রভাব পড়বে তবে কী হবে, এর অনিষ্টতা নিয়েও আলোচনা করেছি। আমি এ ব্যাপারেও সতর্ক করেছি, আজকের মানবসভ্যতা যে অন্যায়-অবিচার, দুর্ভাগ্য ও অকল্যাণ এবং দারিদ্র ও দৈন্যের শিকার হয়েছে, একদল কপট, স্বার্থান্বেষী ও ভয়ঙ্কর জীবনখেলাড়িদের হাতে বিশুদ্ধ আকিদাহর বিকৃতি, পরিবর্তন এবং অপসারণই এর মূল কারণ। এমনকি দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে, দ্বীন-ধর্ম ও নতুন নতুন আবিষ্কারের মাঝে এই ভাঙন আর বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং আল্লাহ-প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ও নতুন নতুন আবিষ্কারের মাঝে একটি স্পষ্ট বিভাজন তৈরি হলো। বিজ্ঞান হয়ে পড়লো ধর্মের প্রধান প্রতিপক্ষ। অবশেষে দেরিতে হলেও বিজ্ঞান সত্য ও বাস্তবতার দিকে ফিরতে শুরু করেছে। নতুন নতুন প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে ইসলামের কোনো বৈরিতা ও বৈপরীত্য নেই। বিশেষ করে মনোবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যার সাথে ধর্মের কোনোই বিরোধ নেই।

হে নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা, এই মহান আকিদাহর নির্মল ছায়ায় অবতরণ করা ছাড়া কোনো পথ নেই, এর নির্মল বাতাসে দেহমন শীতল করা ছাড়া কোনো সুখ নেই। এই বিষয়টি তোমরা তখনই অনুভব করতে পারবে, যখন জীবনের এই হতাশা, দুর্ভাগ্য আর চোরাবালি থেকে মুক্তি পেতে চাইবে এবং নিজেদের অন্তরাত্মাকে নতুন করে বিনির্মাণের শপথ নেবে। কিন্তু তোমরা যদি সেই অশুভ, ভয়ঙ্কর ও দুর্ভাগ্যের পথে হাঁটতে থাক তাহলে তোমরা নিঃসন্দেহে ধ্বংস-বিধ্বস্ত হবে। দুনিয়াও হারাবে, আখিরাতও হারাবে।

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।'[২৭২]

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

'সে ইহ-পর উভয়কালেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটিই প্রকাশ্য ক্ষতি।'[২৭৩]

মানবজাতি তার স্বভাব স্বাভাবিকতার কারণে এই দুর্ভাগ্য আর অনিষ্টতা বয়ে বেড়াতে পারবেনা।

---

২৭২. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৮

২৭৩. সুরা হজ, ২২ : ১১

কিন্তু মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় ব্যাধি আর দুর্ভাগ্য হচ্ছে, ভয়ঙ্কর সব চড়াই-উৎরাই দিয়ে যাতায়াতের প্রবণতা তার মাঝে রয়েই গেছে। সুতরাং সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও পুঁজিবাদের মতো ব্যর্থ জীবনদর্শনগুলো ভয়াবহ বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার পর, স্বভাব-চাহিদার বিভিন্ন রংঢং ও আকার- প্রকৃতির নিচে বিধ্বস্ত হবার পর, মানুষের সীমাহীন কুরবানির পর, তাদেরকে সত্য, সুন্দর ও স্বভাব-স্বাভাবিকতার দিকে ফিরে আসা উচিত।

হে নতুন প্রজন্মের সারথিরা, তোমরা ফিরে এসো। গোটা জগৎজুড়ে ইসলামকে বয়ে চল। এই হতাশা, দুর্ভাগ্য এবং কোনো ত্রাণকর্তার জন্য অপেক্ষমান জগতের কাছে, গোটা বিশ্বসভ্যতার কাছে তোমার মহান বার্তা পৌঁছে দাও। তোমরা যাদের প্রতি নিজেদের আস্থা রাখো এবং যাদের মনে করো যে, তাঁরা ইলম আর আমল দিয়ে এই মহান দ্বীন বয়ে নিচ্ছেন, তাঁরাই এই দ্বীনের আলো ও আভায় নিজেদের আকিদাহর জগৎ শোভিত করেছেন, তাঁরাই নিজেদের ইবাদত আর জীবনবিধানকে এই মহান দ্বীনের নির্মল আলো দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন, তাহলে তোমরা তাঁদের কাছে যাও, তাঁদের পাশে জড়ো হও।

সবশেষে আমি আপনাদের একটি অনুরোধ করছি, আপনারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করুন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি প্রত্যেকেই নিজের সাথে সার্বক্ষণিক কুরআনের ছোটো একটি কপি রাখেন, বিশ্বজগতের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনার কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছেন যেন তা বুঝতে পারেন এবং নিয়মিত অধ্যয়ন বজায় রাখতে পারেন। প্রত্যেকেই হাদিসের ছোটো একটি কিতাব সঙ্গে রাখুন, যেমন রিয়াদুস সালিহিন। আর প্রত্যেকেরই সাইয়িদ আবুল আলা মাওদুদি, সাইয়িদ কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুব, সায়িদ হাওয়া, সাইয়িদ আলি নাদাবি রহিমাহুমুল্লাহু আজমায়িনের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করা উচিত।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلا أَنْتَ . أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

কিছু কথা

ইমামুল জিহাদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এর লিখিত প্রতিটি বই-ই অসাধারণ। কিছু বছর আগেও বাংলা ভাষায় শাইখের প্রায় সকল বই-ই বাজারে পাওয়া যেত। কিন্তু কিছু সময়য়ের ব্যাবধানে একে একে তার সকল বই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। নিরাপত্তার জন্য সকল প্রকাশনী বইগুলো ছাপানো বন্ধ করে দিলো। অনুবাদকেরাও অনুবাদ করা থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন। সত্য অনুসন্ধনী পাঠকেরা তন্ন তন্ন করে বাজারে খুজতে থাকল। কিন্তু প্রতিবারই তাদের নিরাশ হয়ে-ই ফিরে আসতে হলো। বিক্রেতারা প্রকাশনীকে বারবার তাগাদা দিলেও তাদের করার কিছু ছিল না, তারাও বা কি করবে! তারা চাইলেও নিরুপায় ছিল। কিছু ভাই তো এতটা-ই ব্যাকুল ছিল যে, তারা যে কোন মূল্যে কিনতে রাজি ছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। মূলত, শাইখ রহিমাহুল্লাহ কে যে চিনে, তার ভিতর এমন ব্যাকুলতা কাজ করাটাই স্বাভাবিক।

তবে অনলাইনে শাইখ রহিমাহুল্লার কিছু বই এর পিডিএফ পাওয়া গেলেও আকিদাহ বিষয়ক এই মহামুল্যবান বইটি সবার কাছে অধরাই থেকে যায়। এই রত্নটি আমাদের মাঝ থেকে হারাতে-ই বসেছিলো। অনেক ভাই-তো এই বইটি পুনরায় পড়ার আশাই ছেড়ে দিয়েছিল। তাই, আস সাইফ টিম এর ভাইয়েরা অনেক অনুসন্ধানের পর বইটি খুঁজে সেটা থেকে পিডিএফ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই, পুনরায় বইটি টাইপ করা হলো এবং প্রিন্ট খরচের কথা চিন্তা করে ফাঁকা জায়গা বাদ দিয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তেমন কমিয়ে আনা সম্ভব হলো না। তাছাড়া, কিছু বানানের ত্রুটিও সংশোধন করা হয়েছে। আমরা অনুবাদকদের নাম উল্লেখ করে তাদের সম্মাননা দিয়েছি। এর থেকে বেশি কিছু আমাদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না।

আল্লাহর কসম, আমাদের সক্ষমতা থাকলে আমারা নিজেরা-ই অনুবাদ করে আপনাদের কাছে পোঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমরা এখনো সেই সক্ষমতা অর্জন করে উঠতে পারিনি। আল্লাহ আমাদের সেই সক্ষমতা দান করুন। বইটি সকল ভাইদের হাতে পোঁছে দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইং শা আল্লাহ, এটা আপনার জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধি করবে ও আপনার আকিদাহ পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করবে। আপনাদের নেক দুয়া-য় আস সাইফ টিমের ভাইদের স্মরণ করবেন, ইং শা আল্লাহ।

নিবেদক

আস সাইফ টিম